



বাঙ্গালী বউ ৭১৭

সামাজিক উপাখ্যান



বাঙ্গালীমেয়ের নব সংস্করণ।



১৯ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন

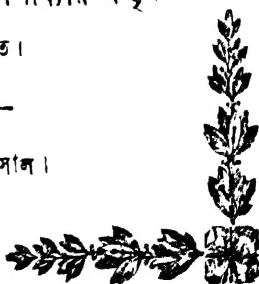
স্বপ্নত পুস্তকালয়

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত।



সন ১২৯৯ সাল।



PRINTED BY P. B. SAHA AT THE "NEW CALCUTTA PRESS"
NO. 3 BEADON SQUARE, CALCUTTA.

৭১১ ক.

বিজ্ঞাপন ।

সংসারিক ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া, ক্ষুদ্র সংসারের ইহা একখানি
ক্ষুদ্র উপন্যাস ।

পূর্বে এই পুস্তকের নাম “বাঙ্গালী মেয়ে” ছিল, কিন্তু বাঙ্গালী
মেয়ে অপেক্ষা বাঙ্গালীবউ, এই পুস্তকের উপযুক্ত নাম বিবে-
চনা করিয়া নাম পরিবর্তন করিলাম !

এ সংস্করণে শেষ দুই পরিচ্ছেদ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

প্রকাশক ।

১১১৭ ৭২৭২২

বান্ধালী বউ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মা ও মেয়ে।

“সরলা! সরলা! ভাত খাবি নে?” এই বলিয়া “বলার” মাতা শিবসুন্দরী সরলাকে ডাকিলেন। দেবিতে দোঁধতে একটা অবিবাহিতা বালিকা বয়স চতুর্দশ বৎসর হইবে হাতে “প্রভাত চিত্রা” জামায়া উপস্থিত হইল। সরলাকে দেখিয়া অমনি আবার বলিলেন,—“মা তুমি পুত্র-বাড়ী গেলে তোমার জন্ম ভাত নিয়ে কে ব’সে থাকবে?” এ কথায় সরলা কোনও উত্তর করিল না। “ভাত কই?” বলিয়া, পুত্রক রাখিয়া খাইতে বসিল। সরলার মাতা সরলার মাতার দিকে একাগ্রদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে মেহের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা কে বলিবে? মাতার মেহ অতুপমেয়, তাঁহার হৃদয়ে কত লহরী উঠে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? তিনি তাঁহার সন্তানের জন্ম যে, কি করিবেন, সংসার দুঁজিয়া পান না। সরলা ভাত খাইতে লাগিল, তিনি তাহার চাঁদপানা মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর, “না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “মেয়ে

আমার এত বড় হইল, পাশ্চাত্য খুঁজিয়া পাওয়া ভার । লোকে কত কি বলে ; কি করি. কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না । কপালে যেকি আছে, কে বলিতে পারে ? কর্তার তো এ বিষয়ে কিছু মাত্র মনোযোগ দেখি না ।” গৃহিণী আর কোনও কথা বলিলেন না । সরলার ভাত খাওয়া শেষ হইল । গৃহিণী সাময়িক কাজ কর্তব্য শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন ; সরলা ভাত খাইয়া আবার “প্রভাত চিন্তা” লইয়া বসিল । সরলার মাতা বাটীর অন্তঃস্থ মেয়েদের সঙ্গে এই দিব্যধর্ম কথা লইয়া নানা রকম আন্দোলন করিতে লাগিলেন । এ পাণ্ডিট ভাল নহে, উহার কুল তত ভাল নহে, ও ছেলের না বাপ নাই, এইরূপ কুলের, রূপের নানাবিধ সমালোচনার প্রবৃত্তি হইলেন । এদিকে সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল ।

পাঠক, এখানে সরলার কিঞ্চিৎ পরিচয়ের আবশ্যক । সরলার পিতার নাম হরপ্রসাদ মিত্র, কলীন্দ্র কায়স্থ, নিবাস পাবনার অন্তর্গত কৈলাসপুর, পদ্মপার । বয়স ৪০।৭৫ বৎসর হইবে, অবস্থা খুব রাজা রাজ্জীর মত নহে ; অথচ, মোটা ভাত কাপড় খুব সুখ-সুখের সহিত চলে । গ্রামে তাঁহার খুব ক্ষমতা ছিল, সকলেই বিশেষ মান্ত ও ভয় করিত । গ্রামের চতুর্পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলি তাঁহার এলাকা ; সুতরাং, অবস্থানুসারে ইনি খুব ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন । ছোট জোতদারের মত বাটীতে সরকার ও দুই একজন সবদার মেলা ছিল । ইনি কিছু কিছু ইংরাজী পড়িয়াছিলেন এবং আজ কাল যেমন দুই এক জন ইংরাজী পড়িয়া পোঁড়া হয়, সেইরূপ ছিলেন ;

অর্থাৎ স্নান করিয়া আত্মিকও করিতেন, আবার জুতা পায় দিয়া থাইতেও ক্রীড়া করিতেন না ! বাড়ীতে নাম বজায় রাখিবার জন্য দোল দুর্গোৎসবও হইত ; অথচ কলিকাতায় গেলে, ব্রাহ্মসমাজেও যাইয়া থাকিতেন । পরীগ্রামে আসিয়াও হুই এক থানা ধবরের কাগজ পড়িতেন । লেখাপড়া-জানা হুই এক জন লোক কাছে আসিলে, সমাজ লইয়া তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতেন, “ইলবার্ট বিল” লইয়াও হুই একটা কথা বলিতেন, শুলের ছেলের লইয়াও হুই এক বার নাড়া-চাড়া করিতেন ; অথচ কিছুই খুব গভীররূপে চিন্তা করিতেন না ; মাঝে মাঝে স্বীকার করিতেন যে, কোলিক্ত প্রথা উঠিয়া যাওয়াই উচিত, সমাজের কিসদংশ সংস্কার আবশ্যক । পৌত্তলিকতার আপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই ; অথচ, এ সমুদয় নিজের উপর দিয়া না যায়, একরূপ ইচ্ছা । কোলিক্ত উঠিয়া যাক, কিন্তু নিজের বংশ-মর্যাদা ছাড়িবেন না আজ কাল ইংরাজী-শিক্ষিত কোন কোন যুবক বেকর নিজের কুসংস্কার বজায় রাখিতে যাইয়া কারন দর্শাইয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ করিতেন । যাহারা হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দিকেও, আবার যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাঁহাদের মতেও সহায়তা করিয়া থাকিতেন । ফলতঃ, তাঁহার কোন মতেই স্থির বিশ্বাস ছিল না । পিতা পিতামহ প্রভৃতি দেবদেবী পূজা করিয়া আসিয়াছেন ; স্মৃতরাং, উহা পৈতৃক কার্য্য এবং করিতে হইবে । সে পূজাতে যে তাঁহার প্রকৃত আস্থা, তাহা নহে । কারণ, পূজার সময় মুসলমান দারগা বাটীতে আসিলে, তাহার সঙ্গে আসিয়া থাইতেও বড় ক্রীড়া করিতেন না ।

কৈলাসপুর গ্রামটী পদ্মার ঠিক অপর পার্শ্বে। নদীর ধারে বটে, কিন্তু গ্রামটী অনেক কালের, গাছগুলি খুব বড় বড়। সাধারণ পল্লীগ্রামের গ্রাম জঙ্গল নহে, বড় বড় বাগান ও মাঠ আছে। গ্রামটী ধনী নহে, কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। সকলেরই দুই একটি গরু বাছুর ও কিছু কিছু অমি আছে। গ্রামে একটি ‘গুরুটে নিং পাঠশালা’ আছে, গুরুমহাশয় যে দুই একটি ছাত্র পান, তাহাদিগকে জমিদারী মহাজনী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেন। দুই এক ঘর ব্যবসায়ী লোক আছে, সুতরাং দুই থানি মুদীর দোকানও আছে। অনেকেই রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারে এবং দুই এক জন কিছু কিছু ইংরাজিও জানে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুই একজন লেখা পড়া জানে। বিশেষ মিত্র মহাশয়ের মেয়ে করতীর বাজালা ভাষায় বিশেষ নুংপক্তি হইয়াছিল। তবে, শিল্প ও চিকণের কার্য্য গ্রাম সকলেই জানিত। গ্রামবাসীদিগের দৈনিক জীবিকা নির্বাহের জন্য জ্ঞানাত্মক বাইতে হইত না। সপ্তাহের মধ্যে এই দিন করিয়া হাট হইত, তাহা হইতে সমুদয় জিনিষ পত্র কিনিয়া রাখিত। দুধ প্রভৃতি পাওয়া যাইত। ইহার পর তৈলগুড়ের দরকার হইলে, অমুখিয়া হইত না। কারণ, কল বাড়ী ও মুদীর দোকান গ্রামেই। সমস্ত পল্লীগ্রামে সমুদয় সুবিধা থাকা আবশ্যক; কৈলাসপুরে তাহার সংক্ষেপভঃ সমুদায়ই ছিল।

সর্ব্বভুক্ত মিত্র মহাশয়ের চারিটা সন্তান। জ্যেষ্ঠা, তরলার বয়সক্রম ১৬১৭ বৎসর হইবে। বিধবা, ঈষৎ দীর্ঘাত্মা, গৌরবর্ণা, স্বভাবতঃ চিন্তাশীলা ও অল্পমনস্ক। মুখ থানি দেখিলেই তাহার

কিন্তু দুর্ভিক্ষসহ বেদনা স্পষ্টই অনুভূত হয়। মিত্র মহাশয় তরলাকে গোবিন্দগ্রামে একটি জ্বল পাত্র দেখিয়া অতি প্রায় বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির বিপাকে নবম বর্ষে পড়িতে না পড়িতেই, জন্মের মত এ জন্মের সকল সংঘে বঞ্চিত হইল। নবমবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইল। এই অবধি তরলা প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকিত, মাঝে মাঝে স্বশ্রম-লব্ধ দাঁড়িয়াও থাকিত। সেখানে তাহার শওর ও দেবর ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহার তাহাকে যারপরনাই ভাল বাসিতেন। তরলা বাপের বাড়ী থাকিলে, তাহার দেবর প্রায়ই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহারই ঐকান্তিক উদ্যমে ও যত্নে তরলা তাহার কনিষ্ঠা এত লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছিল।

তরলার ছোট আর একটি কণ্ঠা। ইহার নাম সরলা এবং ইহার কথাই আমরা পূর্বে বলিতেছিলাম। কুণীর মেয়ে সুবিধামত পাত্র না পাওয়ায়, মিত্র মহাশয় এ পর্যন্ত তাহার বিবাহ দেন নাই। বড় মেয়েটী আর বয়সেই বিধবা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, মিত্র মহাশয় সরলার বিবাহের ভাব তত সচেতন ছিলেন না। সরলা তাহার জন্মের সাত তত দীর্ঘিকা ছিল না। কিন্তু বয়সেইরূপই কামো চোখ গুলি দুই টানা টানা, লেখনি হাসি হাসি। হাত পা বেশ গোল গোল। সরলা তরলার সাত তত চিন্তাশীল ছিল না; অথচ বেশ শান্ত কথারও সঙ্গে বেশী কথা কহিতে ভালবাসিত না। আপনাব মনে আপনিই কাজ করিত ও পড়িত। পরীক্ষামে থাকিয়া বেশী পড়া যতদূর শিখা করা সম্ভব, সরলা নিজের বয় ও

তরলার দেবরের চেষ্ঠায় তাহা শিখিয়াছিল। অনেক ভাল ভাল বাল্মীকী গ্রন্থ পড়িয়াছিল এবং হাতে সুন্দর লিখিতে পারিত। বিশেষ শিল্প ও কারু কার্ঘ্যে সে তাহার সমদক্ষতা প্রাপ্তি কি অনেক বরোজ্যোষ্ঠাকেও পরাভব করিয়াছিল। গৃহের আবশ্যকীয় কাজ, রন্ধনাদি সরল তাহার মাতার গুণে সমুদয়ই শিখিয়াছিল।

দুই ভগ্নীর মধ্যে খুব ভাব ছিল। তাহারা একত্র হইত, একত্র পড়িত, কিন্তু একত্র খাইতে পাইত না; কারণ, তরলা বিধবা অবসর পাইলে, দুইজনে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া গল্প করিত। সরলা নির্জনে বসিলেই তরলার কথা ভাবিত। তরলার যে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিত না; কিন্তু তাহার দিদি অনন্ত দুঃখে দিন কাটায়, কি যেন কি একটা হইতে প্রভিত হইয়াছে, জুড়য়ে কি একটা ঘোর ব্যত্যয় বহিতছে, তাহাই ভাবিত; কিন্তু ভাবিয়া স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিত না। দিদি সুখে তাহার সুখ, দিদির দুঃখে তাহার দুঃখ। তরলা যখন নিজের অতৃপ্তের কথা ভাবিত, সরলা তাঁহার যেরূপাখা মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। বোধ হয় মেঘে বুঝিতে পারিত দিদি কি পরমন্ত হারাইয়াছেন!

জ্যৈষ্ঠ মাস বেলা অপরাহ্ন, দারুন গীঘ্র। দুই বোনে আর ঘরে থাকিতে পারিল না, যে বাহার পুস্তক ও পশন জইয়া, তরিতপদে অন্তঃপুরমংলয় জুড় একটা উদ্ভ্রমে গমন করিল। স্বনামপ্রসিষ্ট বুদ্ধব্রাহ্মণ ছায়া সারাদিন স্থানান্তরিতকৈ প্রতিরোধ করিয়া বাগানটিকে অপেক্ষাকৃত অনেক শীতল করিয়াছিল। একটা ক্ষুদ্র গুল্মবীণী, তাহাতে একটা ক্ষুদ্র ইষ্টক

নিশ্চিত ষাট। দুই বোনে বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় যাইয়া বসিল।

তরলা বলিল,—“তাই ত ঠাকুরপো এখনও আম্‌চেন না কেন।”

সরলা কহিল,—“তা এখনও সময় যায় নি।”

তরলা। তা, তুই তবে চিঠিতে কি প’ড়’লি ?

“কেন, এই তো” বলিয়া, সরলা এক খানি হস্তস্ব পত্রে কিয়দংশ এইরূপ পাঠ করিল,—“বোধ হয় সংবাদ পত্রে পড়িয়া থাকিবে যে, হুৱেল্ল রাব্ব বিনাপ্রাধে ভেলে গিয়াছেন। আমি ও আমার আর দুই একটী বন্ধু তাঁহার মোকদ্দমার জ্ঞাত গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিতেছি। কাল বেলা ৪টা আন্ধার সময়ে তোমাদের গ্রামে যাইব; তোমার পরামিত আমার আর দুইটী বন্ধু আমার সহিত যাইবেন।” সরলা হঠাৎ পত্রপাঠ বন্ধ করিয়া সোংসায়ে বলিল,—“দিদি, এ বন্ধু দুটী কে ?” তরলা দ্রবং হাসিয়া বলিল,—“তোমরা শুনে দরকার কি ?” সরলা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। তরলা অবার হাসিয়া বলিল;—বোধ হয় ইল্লনাথ আর—“কথা বাধা দিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিল,—“সেই—ই—স্ব—না—?” বলিয়াই মহা লজ্জিতা হইল। বালিকার গণ্ডে রক্তিম আভা দেখা দিল। তরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, “সেই তো আমার কে ?” সরলা চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয়, তাহার স্বপনের আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তরলা তাহার আভাবিক দৃষ্টির পরে আপনা আপনি কহিল,—“বাগবিচ ঘোবিন্দগ্রামে অনেক ভাল ছেলের কথা শুনিতে পাই, কিন্তু ইল্লনাথের মত ভাল

হেলের কথা কখন ব'য়েতেও পড়ি নি। বোধ হয়, এই ভুলই তারে লেকে এত ভাল বাসে।" এই বলিয়া ভয়ীর মুখের দিকে রেহনযমে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "সরলা রে ! তোর কপালে কি এমন রহ মিলবে ?" মহালজ্জিতা সরলার মৌভাগ্যক্রমে দিদিকে কথা শুনে লইবার সুবিধা হইল। সে দূরে কয়েকটা ভদ্রবেশী পুরুষকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি ! ঐ বুঝি তাঁরা আসছেন !" তরলা "আমি ইচ্ছনাথকে চিনায়াইয়া দিই নে" বলিয়া, মহা কুজ্জিতা সরলার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সবলে লইয়া চলিয়া গেল।

পাঠক ! বালিকা কি কখন ওপের পক্ষপাতিনী হয় ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কুটুম্ব-সন্দেশ ।

প্রায় সন্ধ্যা ; সূর্য্যদেব এখনও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হন নাই। সূর্য্য কিরণ পশ্চিম আকাশে চিক্ চিক্ করিতেছে। রেহনযমপুরের কৃষকগণ গরু বাছুর লইয়া আপন মনে গাইতে গাইতে মঠ হইতে বাড়ীর দিকে যাইতেছে। অগ্রেই বলিয়াছি, রেহনযমপুর ; বিশেষ, আজ ঝড় বৃষ্টি কিছুই নাই, যুব গরম পাড়য়াছে। গাছেব পাতাগুলি আশ্বে আশ্বে নড়িতেছে ; চিহ্ন সমস্ত দিন নব জৌর পড়ায় এখনও গরম যাইতেছে না। মিল মহাপর পরনে ঘরের ডিতরে না থাকিতে পারিয়া, প্রাঙ্গণে দৃষ্টিয়া

বেড়াইতেছেন। সারাদিন গাছের ছায়া পড়ায় তত রৌদ্র লাগে নাই ; সুতরাং, বাহরে বেড়ান তাঁহার পক্ষে একটু শান্তিপ্রদ হইতেছিল। দুই এক জন লোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতোছিল এবং তাঁহার কথার সত্যাসত্য বিচার না করিয়া হাঁ দিয়া বাটতেছিল। কৰ্ত্তা বলিলেন, “আজ খুব গরম পড়িয়াছে, না হে।” “আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ খুব গরম। হবে থাকা দায়।” কৰ্ত্তা আবার বলিলেন, “কিছু এখানে শীতল বাতাস বহিতেছে।” অমনি পশ্চাদ্ভর্ত্তী লোকগুলি মারি মারি কারিয়া বলিয়া উঠিল, — “আজ্ঞে, আমাদের সরকারী বাড়ী খুব ঠাণ্ডা!” পল্লীগামের জোতদার মহাশয়েরা এক রকম তাঁহাদের চতুর্পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলির আদালত। গায়ে যাহা কিছু হয়, তাহা তিনিই করেন, শাসনাদির ভার তাঁহারই উপর। খুব বড় পোছের হাক্কামাও আদালতের মুখ দেখে না। দারোগা সাহেবের প্রসাদে সমুদয়ই জোতদার মহাশয় করেন। লাভের অংশ হইতে কিছু কিছু দারোগাকে দিয়া থাকেন। বাটীতে আম কাঠাল প্রভৃতি বাধা কিছু হয়, কিছু কিছু দারোগা সাহেবের বাসায় যায় ও তাঁহার পরিবার আসিতে হইলে, বাসা স্বর তৈয়ারি করিবার দাশও বাইয়া থাকে। পুণ্য বা অজ কোনও ব্যাপারদি হইলে, দারোগা মহাশয়ের নিমন্ত্রণ হয়। এইরূপ নানা সুবিধা পাইয়া, দারোগা, জোতদারদের মতে মত দিয়া চলেন। দুই একটা মোকদ্দমা ধানায় উপস্থিত হইলে, ফরিয়া-দৌদিগকে তাড়াইয়া দেন, কনেটবল গিয়া গোপনে জোতদার মহাশয়কে খবর দেন। কাজে কাজেই জোতদার একরূপ চতুর্পার্শ্বস্থিত গ্রাম সমুদয়ের হর্ত্তা কৰ্ত্তা ও বিধাতা। বড় জমিদার

হইলে, তো কথাই নাই, দারোগা তাঁহার গোলাম । টাকা বড় জিনিষ । ইহাতে সবই হয় । এক সূত্রে আমাদের মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে দুই এক জন লোক অনবরত থাকে । মিত্র মহাশয় লোক জন ছাড়া প্রায়ই থাকেন না । কেহ বলিতেছে, “কর্তা, অমুক আমার “মফঃস্বলকে” গালি দিয়াছে ; কেহ বা বলিতেছে, “কর্তা ছেপনের জমিটা আমাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন, নজরের ভণ্ড কিছু ভাবতে হবে না ।” সে যাহা হউক, কর্তা মহাশয়েরা যে আবার যথার্থ বিচার করেন, তাহা নয় । তাঁহাদের মোকদ্দমার ডিক্রী ও ডিস্‌মিস্ টাকার মধ্যে । যাহার টাকা আছে, সে দোবী হউক, আর নির্দোষী হউক, তাহার বিরুদ্ধে রাশ দিতে হবেই হবে । যেন তেন প্রকারেণ কিছু টাকা আদায় হবেই হবে । বিচার কে চায় ? গাঁয়ের মোড়ল গুলি কর্তার বশ । তাঁহাদের কোন ইচ্ছা সাধন করিতে হইলে, কর্তার নিকটে আসিয়া সেলাম দেয় ও কিছু নজর দাখিল করে । পোমস্তা মহাশয়দিগকে কিছু তহরী দেওয়াও হয়, অমনি কাজ সফল । বায়ু অগ্নির সমাগম, কে সামুনে দাঁড়ায় ! কর্তাও তাহাতে রাজী হন, কারণ, মুরুস্বী লোকগুলি হাতে রাখিলে, কিছু কিছু টাকা পাওয়া যায় ও চাঁদা ধরিবার দরকার হইলে তাহাদের দ্বারা লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কার্য সাধন করেন । পূজা কি কোনও বৃহৎ ব্যাপারাদি উপস্থিত হইলে টাকার বড় দরকার হয় । কর্তা টাকা দিতে পারেন না কিন্তু নামটী বজায় রাখা দরকার । দুই একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করানও দরকার ; সুতরাং, গরিব প্রজাদের সন্ধান । মুরুস্বীদিগকে ডাকাইয়া পাঠান, হল হল চক্ষে বলা হয়, “ওহে, এবার আমার

বা বার্ষিক লোপ হইল !” অমনি মুকুন্দীরা সমস্তরে বলিয়া উঠিল—“তাহাতে কি, কিছু চান্দা জুলিলেই হইবে। বার্ষিক বন্ধ হইতে পারে না।” কিন্তু কেহ বুঝে না যে, তাহাতে গরীব প্রজাদের সর্বনাশ ! ফলতঃ, গাঁয়ের মুকুন্দীগুলি অত্যাচারী জমিদারের যত্ন। আবার অর্থলোভী জমিদারও তাহাদের অভীষ্ট সাধনের প্রযত্ন উপায়। এইরূপ সামান্য পল্লীগ্রামে যে কি হয়, তাহা কজন ভাবিয়া দেখেন ও কয়জন আলোচনা করেন ? অপর পক্ষে ইহা আবার জমিদারদের তু দুঃখ নহে অমুকরণের পরিণাম। লোকের স্বভাব স্বতঃই অমুকরণপ্রিয়, যাহা দেখে তাহাই করে। আপনা হইতে উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদিগের কাণ্ডের ভাষাভাষ্য বিচার না করিয়া অমুকরণ করে। বড় বড় জমিদার, রাজা, মহারাজা যাহা করেন, ছোট ছোট জোতদার গোমস্তা তাহাই করিতে চেষ্টা করে। তাহাদেরও ইচ্ছা যে, তাহারা সেইরূপ ক্ষুদ্র গ্রাম কয়লাখনির মানুষ ব্যাপ্ত হন। পাঠক, আমাদের মিত্র কহাশয় এই জাতীয় একটি জোতদার।

ক্রমে গরম বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। মিত্র মহাশয় দুই এক জন লোক সঙ্গে বাটীর বাহির হইলেন। এ কথায় ও কথায় দুই এক পা করিতে করিতে একটি পাছতলার গেলেন। গাভিট দুই পুতান, ডাল পালা খুব বড় বড়, কোপ্লা, অনেক স্থান ব্যাপিয়া আছে, নীচে ছায়া ; সুতরাং, স্থানটি তত গরম নহে। বৃক্ষতলে একটি মাদুর বিস্তৃত ; জন কত লোক তাস খেলিতেছে, কেহ বা ইন্দুর বিক্রি কাবার করিতেছে, কাহারও হাতে হস্তর, কাহারও হাতে পকান, এইরূপ

নানাবিধ, খেলার তরঙ্গ এবং গগনভেদী চীৎকার ধ্বনি উঠিতেছে। তাস খেলা পদ্মীগ্রামের একরূপ নিত্য কৰ্ম্ম। সকলেরই কিছু কিছু বিষয় আছে, তাহাতে পরিবারের মোটা ভাত কাপড় চলে, এবং পূজার সময় ছেলেদের দুই এক ছোড়া জুতা ও পোষাক কিনিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ, যে সামান্য বিষয়, তাহার কার্য্যাদি করিতে হইলে, তত সময় আবশ্যক করে না। ইহারা এক প্রকার নবাব বাড়ীর আলগে। ঘুম ভাঙ্গিলে, বিছানা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া “জমা ধরচ” ও “বাকী” দুই এক ফর্দ লিখিয়া তাস খেলিতে বসেন। স্নান করিবার সময় হইলে, স্নান করিতে যান। আহায়াগুে একটু নিজা দেন। তাহার পর, আবার খেলার তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতে থাকেন। কিন্তু ইহারা প্রায় সকলেই সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন, এবং দেবীর অনুগ্রহেই মাঝে মাঝে বন্ধিম বাবুর বা মনোমোহন বাবুর দুই এক খানা বই পড়িয়া থাকেন। কখনও বা বাজার সূরের ঢেউ তুলিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ পড়া হয়।

মিত্রমহাশয় বেড়াইতে বেড়াইতে এই খানে ঘাইয়া দাঁড়াইলেন ও খেলার নানাবিধ সঙ্কেতাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপ হেলিতে ছলিতে হাসির তরঙ্গে ও গভীর চিন্তায় তাস ক্রীড়া চলিতেছে! এমন সময়ে তিনটি যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিন জনই প্রায় সমবয়স্ক, দুই এক বৎসরের ছোট বড় হইলেও হইতে পারে। তিন জনেরই জামার কাল ফিটা। পদ্মীগ্রামের লোক তাহাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ডাকাইয়া রহিল। জামার কাল ফিটা এক নূতন দৃষ্ট। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; কারণ,

ভয়লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে প্রায় সকলেই ধমুর্জর ! মিত্র মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কিছু, অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বাবাজি, বাড়ীর সকলে ভাল ত ?” অধবর্তী যুবক উত্তর করিল, “আজ্ঞে ! হাঁ” অপর দুইটি মিত্র মহাশয়ের অপরিচিত ; সুতরাং, তিনি বিশেষ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন । পাড়ারগেয়ে লোক—সকলেই তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল ও পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিল । বাইতে বাইতে মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল কথা, বাবাজি হাতে কাল ফিতা কেন ?”

যুবক উত্তর করিলেন,—“কেন, বঙ্গবাসীতে কি পড়েন নাই, সুরেন্দ্র বাবুর কাণ্ডারাস হইয়াছে ?”

মিত্র । হাঁ পড়িয়াছি, কিন্তু তাতে আবার কাল ফিতা কেন ?

যুবক । সকলেই তাঁহার জেল হওয়ার্তে শোক-চিহ্ন স্বরূপ এই কাল ফিতা ধারণ করিয়াছেন ।

এইরূপ সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমা লইয়া মানাবিধ কথাবার্তা ও সমালোচনা করিতে করিতে সকলেই মিত্র মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন ।

পাঠক ! গাঁহার সহিত মিত্র মহাশয় পরিচিত ভাবে আলাপ করিলেন, ইনি আমাদের পূর্বকথিত তরলার দেবর, ইহার নাম স্ত্রীমাচরণ বিবাস ! অপর দুইটি যুবক ইহার বন্ধু ও এক গ্রামেই বাস । তদনন্তর, একটি ইন্দ্রনাথ সিংহ, জাতিতে কারয় । অপরটীর নাম মাধবচন্দ্র ব্রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ ।

ইহারা তিন জন সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার জন্ত চাঁদা আদায় করিবার জন্ত গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছিলেন এবং সেই জন্ত এখানে আসিয়াছিলেন ; বিশেষ শ্রামাচরণের মনোপ্ত ভাব ছিল যে এই অবসরে ইন্দ্রনাথকে সরলাকে দেখাইবেন । সরলার সহিত যাহাতে ইন্দ্রনাথের বিবাহ হয়, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং ইন্দ্রনাথকে সরলার রূপ-গুণের কথা পূর্বে অনেক বলিয়া সরলার প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন ।

মিত্র মহাশয় বাটীতে আসিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসাইলেন ও শ্রামাচরণের নিকট তাঁহাদের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া নানাবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন । এ দিকে ভীতিবৎ ডাকায় শ্রামাচরণ তথা হইতে উঠিয়া বাটীর ভিতরে গেলেন । সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রামাচরণ যথাবিধি প্রণামাদি করিয়া বসিলেন । তাঁহার ভীতিবৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“আর কে কে আসিয়াছে ?” শ্রামাচরণ বলিল, “ইন্দ্রনাথ ও মাধব” । তরলা ইহাদিগকে বিশেষরূপে জানিত; কারণ, ইহারা শ্রামাচরণের সহিত সদাসাক্ষর্য্য তাঁহাদের বাটীতে বাইতেন এবং তরলার নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন । তরলার মা ভদ্রলোক বাটীতে আসিয়াছে বলিয়া জল খাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । ওদিকে মিত্র মহাশয় মাছ দুধ আনিবার জন্ত লোক পাঠাইয়া দিলেন । হিন্দু পরিবার ভদ্রলোক আসিয়াছে ; খুব কাণ্ড কারখানা উদ্ভূত । জল খাবার প্রস্তুত হইল, বাটীর ভিতর হইতে সংবাদ আসিল । মিত্র মহাশয় ইন্দ্রনাথ ও মাধবকে সঙ্গে করিয়া বাটীর ভিতর

গেলেন। জলখাবার স্থানগুলি পৃথক্ পৃথক্ হয় নাই দেখিয়া মাধবচন্দ্র বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। মিত্র মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “তাহাতে কি ? আমরা অত মানি না, তবে পাড়ার মধ্যে থাকি, না করিলে লোকে দোষে ; স্থানবিশেষে সবই হয়।” মাধব কিছু লজ্জিত হইয়া বসিলেন। নানাবিধ কথাবার্ত্তায় জল খাওয়া শেষ হইল এবং তাঁহারা পুনরায় বাহির বাটীতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ছুই বোন ।

ক্রমে রাত্রি হইল। নানাবিধ গল্পে সমাজ ও রাজকর্ম্মচারী-দিগের কার্যের আলোচনার ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ও অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। পল্লীগ্রামে—সন্ধ্যা হইলেই গৃহস্থগণ আহারাদি করিয়া শয়ন করে। কৃষকগণ সারাদিন পরিশ্রমের পর যেই শয়ন করে, অমনি গিড়োর নিদ্রায় নথ হয়। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। মিত্র মহাশয় রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া মাধবচন্দ্রের রান্নার জোন্ডা করিয়া দিতে বলিলেন। মাধববাবু বাটীর ভিতর একখানি খরে রান্না করিতে গেলেন। এ দিকে ইন্দ্রনাথ ও শ্যামাচরণের সহিত মিত্র মহাশয়ের নানাবিধ আলাপ হইতে লাগিল, মাধববাবুর রান্না শেষ

হইল। তিনি ইক্ষনাথকে ডাকিলেন। মিত্র মহাশয়ের নিকট বিদায় হইয়া ইক্ষনাথ বাবু শ্রামাচরণ বাবুর সহিত মাধব বাবুর নিকটে গেলেন। মাধব বাবু ঘরের ভিতর আহার করিতে বসিয়াছেন; তাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া নানাবিধ গল্প করিতেছেন; এই সময়ে সরলা দুধ লইয়া আসিল। হিন্দু পরিবারের স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই লজ্জাশীল; বিশেষতঃ, অশরচিত জনের সম্মুখে তাহাদের উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস নাই, সমাজের নিয়মও নাই। সরলা অবিবাহিত ছিল; সুতরাং, তাহাকে দিয়া সরলার মাতা দুধ পাঠাইয়া দিলেন। শ্রামাচরণ বাবু ইক্ষনাথ বাবুকে সন্দেশ করিলেন। সরলা ইক্ষনাথের গুণের কথা পূর্বে সরলার মুখে অনেক বার শুনিয়াছিল। অবিবাহিত কন্তা থাকিলে, গ্রামের এবং তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামে ভাল ভাল ছেলের কথা অনবরত আন্দোলন হয়। বিশেষতঃ ইক্ষনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার মিশনারি কলেজে পড়িতেছেন, এবার এফ্, এ, পরীক্ষা দিবেন। সুতরাং, তাঁহার কথা লইয়া মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। সরলা দুধ দিয়া ফিরিয়া ঘাইবার সময় ইক্ষনাথের দিকে ডাকাটিল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। বালিকার সরলার হৃদয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, “ইক্ষনাথ তোমার হইলে কেমন হয়?” “সরলা কোমল কুটিলতা-শূন্য সরল হৃদয়ে কি যেন প্রবেশ করিল! সে তাহা বুঝিতে পারিল না। বুঝিল না যে, সে পূর্বেই ইক্ষনাথকে ভাল বাসিত এবং এখন এই দেখাতে সেই ভালবাসার প্রোত তাহার মনে দ্বিগুণ বেগে বহিল। একত ও স্বর্গীয় ভালবাসার উৎপত্তি, প্রথমে ওপাবলী প্রবণে বা দর্শনে ;

তৎপরে, পরস্পরের সাক্ষাতেই হইয়া থাকে। তখন যে দেখিবার
মাত্র মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত না হয়, সে প্রাণ খুলিয়া
আপনা ভুলিয়া ভাল বাসিতে পারে না। যাহার ভালবাসার
প্রথম উৎপত্তির কারণ সামান্য পরিচয় মাত্র, যাহাতে উদ্বিগ্নতা
নাই, চিন্তা নাই, সে ভালবাসার সুই উদ্বিগ্নতা। দেখিবার
জগৎ অদ্বিগ্ন হওয়া, কাছে গেলে, অগন ভুলিয়া যাওয়াই সুখ।
সরল। ইন্দ্রনাথের কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার প্রতিবিশ্ব
জ্ঞানের দেখিতে দেখিতে, অকস্মৎ হইয়া চলিয়া গেল। মধব
চন্দ্রের আহ্বার শেষ হইলে, ইন্দ্রনাথ, শ্রমচরণ ও মিত্র মশায়
বাণীর ভিতর আহ্বারে বসিলেন। ঐশ্বর্যশূন্য সচিবতা
বাণীকা গোপনে বসিয়া এচটুই ইন্দ্রনাথের মুখ পানে
চাহিয়া রহিল; কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। অভূতপূর্বে
তরঙ্গের স্বাভাবিক তীব্রতা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে
লাগিল। হেমন্ত জলের নতন গেলের তীব্র জলে উঠিতে
লাগিল, আবার জলে মিশিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ-মহস্য মুখ
ভুলিয়া সালতায় পূর্ণ হইল চকু দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন
যে চকু দুইটী দুটি তাঁহারই মুখের উপর নিপতিত। শীঘ্র
শিরায় শিরায় বেগে রক্ত-প্রোত বহিতে লাগিল। আবার
বেরিলেন, সেই দুইট চকু! হাতের প্রাস ভাঙেই রহিল। আবার
দেখিলেন, সেই দুইটী চকু! তাঁহার আর পাছা হইল না,
আর একবার দেখিলেন, সেই দুইটী চকু বিশিষ্ট এক অনিন্দ্য
সুন্দর বন্দন। যাহা দেখিলেন তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিলেন
না। যদিও এই চকু আনিবার সময় পূর্বে একবারে দেখি-
য়াছিলেন, কিন্তু সে ভাল করিয়া দেখেন নাই। এইরূপে

চারি বার চারি চক্ষের মিলনের পর, ইন্দ্রনাথ সেই মুখখানি আর একবার দেখিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না, সরলা মুখ লুকাইয়াছিল । আহাৰাদি শেষ হইলে ইন্দ্রনাথ, স্নানোত্তর ও মাধবচন্দ্র বাহিরের ঘরে একত্র শয়ন করিলেন । মিত্র মহাশয় ক্রিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের সহিত নানাবিধ গল্প করিয়া চলিয়া গেলেন ; কোণায় গেলেন, কেহই তাহা দেখিতে পাইল না । এদিকে, সরলা তাহার জ্যেষ্ঠা তরলার নিকট শয়ন করিতে গেল । দুই জন গভীর নিশিথে আজ হৃদয় খুলিয়া এক নূতন গল্প করিতে বসিল । সরলা আজ গভীর চিন্তাশীল । তরলা গৃহস্থের সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“সরলা, ইন্দ্রনাথকে দেখেছিস্ ?”

সরলা কোনও উত্তর করিল না । তাহার হৃদয়ে চিন্তার স্রোত বহিতেছে । কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না । ক্রিয়ৎক্ষণ পরে, অন্য একটা কথা লইয়া বলিল, “না দিদি ! ইহঁরা বেশ কাণ্ড করিতেছেন ; এই টাকা দিয়া বোধ হয়, সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার আপীল হইবে।”

তরলা । ইহঁদের ও পর কথা তোকে আর কি বলিব, দেশের জন্ত যোগ করা উচিত, যত্ন ইহঁরা করিতেছেন ।

সরলা । বোধ হয়, সকল নেশেই এইরূপ টাকা আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে, ছুটী হওয়াতে ইহঁদের খুব সুবিধা হইয়াছে ।

দুই ভগিনীর নানাবিধ কথাবার্তা হইতে লাগিল । ইন্দ্রনাথের গুণের কথা শুনিয়া সরলা আত্মানন্দিত হইল ; কিন্তু, লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না । ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া

আসিল । সরলা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল । কিন্তু
হায় ! বালিকা সরলার চক্ষে আর আজ নিদ্রা নাই, আজ
তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের অনন্ত ছবি ! কোমল-প্রাণী আজ
চিন্তার ভারে হাবু ডুবু খাইতে লাগিল । আজ তাহার হৃদয়ে
শান্তি নাই, সে বালিকা-স্বপ্ন চপলতা নাই । এক মুহূর্তে
বালিকা সংসারের কীট হইয়া পড়িল ! জাগ্রৎ অবস্থায় সুখ ও
দুঃখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—প্রকৃতির সঙ্গে কোমল প্রাণটি
আজ নিস্তরঙ্গ—নীরব প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণ মিশাইয়া আজ সে
এক পতীর কথা ভাবিতে বসিল ! এইরূপ চিন্তায় অনন্ত শ্রোতে
ভাসিতে ভাসিতে সরলা নিদ্রাভিত্তিতা হইয়া পড়িল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

প্রেমাস্কুর ।

পর দিবস প্রভাত হইলে ইন্দ্রনাথ, মাধবচন্দ্র ও গোমাচরণ
মিত্র মহাশয়ের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ট্রাহানের পথবা-
হানে প্রমোদগুপ্ত হইলেন । মিত্র মহাশয় তাহাদিগকে যথা-
রীতি সমাদর করিয়া পুনরায় আসিতে অনুৰোধ করিলেন ও
গোমাচরণকে গোপনে ডাকিয়া বহুতে ইন্দ্রনাথের সহিত
সরলার পরিচয়সম্বন্ধ স্থির কর, এমনত চেষ্টা করিতে বলিলেন ।
বন্ধুত্ব কৈলাসপুত্র পরিভ্রমণ করিয়া গোমাচরণে প্রমত্ত করিলেন ।
নির্বোধ সরলার প্রীতি ও শাস্তি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের

বকে অনন্ত কালের অন্ত লুকায়িত হইল। সমাজের চিত্ত। আজ বালিকার কোমল হৃদয়ে নূতন প্রবেশ করিল। বিবাহের তার দংশন আজ সে প্রথন অনুভব করিল। আর বিষ্ময় তা পূর্বে যে পর ছিল, তাহার ছবি কল্পনাতেও মনে আসিত না; আজ সে আপন হইতেও আপন, আজ তাহার ছবি হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণে স্থির হইয়া ন্রহিয়াছে; সংসারের অকূল সাগরে অঞ্জ বালিকা না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, মনের আবেগে কাঁপ দিল। বালিকা-মুগ্ধ ক্রোড়ের জিনিষে আজ তাহার আসক্তি নাই, প্রীতি নাই। হঃসিনী সমাজ-পীড়িত, অশান্তি-ভোগিনী জ্যেষ্ঠা তরল রুখ-কাহিনীতে আজ তাহার সগমুভূতি হইল। আজ সরলার হৃদয়ে একটা নূতন দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। আজ তীব্র সম সোচক সংসারের সমক্ষে বালিকা এক নূতন অভিনয় দেখাইতে যবনিকা তুলিল। ভবিষ্যৎ জ্ঞানশূন্য, বিমোহিতা বালিকা বুঝল না যে, এ দৃশ্যের আর শেষ নাই, এ যবনিকা আর ইহকালে পড়িবে না। ক্ষুদ্র তরলী যে অনন্ত ও কবিত্রাণ্ড প্রোতে ভাসিল, সমস্ত জীবন সেটা করিলেও আর সে কূলের দেখা পাইবে না। যে কুলা একবার ছাড়িয়া তরলী চলিল, সে কূলে আর ফিরিবে না। সরলা আজ হইতে সংসার-যাতনার একটা কীট হইল। চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকা আজ এক মুহূর্ত্ত প্রোচ্চ হইল। তাহাকে দেখিলে যাহাই অনুভূত হউক, সরলার অভ্যন্তরিক স্বাভাবিক প্রতিবাদে সে কেহ আর তাহাকে বালিকা বলিতে পারেন না। আজ হইতে তাহার চলতায় শেষ হইল। সংসারে সরলার আজ এক নূতন জীবনের সূচনা হইল। দেখিতে দেখিতে গেল; অদিক

হইয়া গেল, ঘোঁড়া খরতর হইয়া উঠিল। সরলার বাহুজ্ঞান নাই, ধ্বন-গৃহে চূপ করিয়া বসিয়া আছে। সরলার মাতা গৃহস্থের কাজ কর্ত্তে ব্যস্ত থাকায়, কেহ তাহার অমুসন্ধান করিল মা। অমুসন্ধান করিবার প্রয়োজনই বা কি? এরূপ দৃষ্ট এক প্রকার অভূতপূর্ব বলিণেও ঘোব নাই। কাহারও সমাগম সরলার নিকট প্রীতিপ্রদ নহে; সুতরাং, সে একাকিনী থাকিয়া চিন্তার অমুকুল তরঙ্গে বাহিয়া চলিল। প্রণোয়নস্বভাব চিন্তাই সুখ। কিন্তু তরল কোথায়? তরল তাঁহার স্নেহ-পুতুগী প্রাণের ভগিনীর হৃৎথে গলিয়া গেল; কিন্তু, জানিতে পারিল না, তাহার শ্রিতমা সহোদরার হৃৎথ কি?

এইরূপ ষাটনার সরলার এক দিন চলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ পরদিন বাটী ফিরিয়া যাইবার সময় আবার মিত্র মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাটীর ভিতর সংবাদ গেল, আজ সরলার জগরে আবার উচ্ছ্বাস—আজ সেই ইন্দ্রনাথকে আবার দেখিতে পাইবে। ইন্দ্রনাথ বাবু মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সরলার আবার পূর্ব চিন্তা ও উদ্বিগতা উপস্থিত হইল সরলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিল।

ক্রমে ক্রমে সরলার অজ্ঞমনস্কতা, চিন্তা ও হৃৎথ পরিবারস্থ সকলেই অবগত হইলেন; কিন্তু কেহই স্পষ্ট কিছু বুলিতে পারিলেন না, কারণ, এষ্ট দৃষ্টটী তাঁহাদের নিকট অদৃষ্টপূর্ব। চতুর্থ তরল ভগিনীর হৃৎথের কথা জানিবার জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার চোখা যে, তিনি সরলার মনের কথা স্পষ্ট শুনেন। সরলার সমবয়সী তাহার একটা

জেঠীমাতা ছিলেন। তহলা তাঁহাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন।

হরকুমার মিত্রের বড় এক ভ্রাতা এই পরিবারস্থ ছিলেন। ইনি সহোদর নহেন, আপাততঃ বংশ-প্রের্থ। বয়স ৬০ বৎসরেরও অধিক। তাঁহাকে আমরা সরলার সম্বন্ধস্বামী জেঠী বলিলাম, ইনি ইহাঁর চতুর্থ সংসারের পত্নী। কুসংসারের সমাজে পরসী থাকিলে সমুদয়ই হয়। এই পরসার বলে এবং কৌলীন্তের প্রাপ্যে মিন মহাশয়ের ভ্রাতা একটা অবলা বালিকাকে বিধবা করিতে—নির্ধন সমাজের অত্যাচার-শৃঙ্খল আজীবন বদ্ধ করিতে—বিবাহ করিয়াছিলেন। অভাগিনী বালিকা কি করিবে? সমাজে স্ত্রীলোকের কথা কল্পজন শুনে? তাহাদের বিষয় কল্প-জন নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করে? কল্প জন স্বপ্ন পাতিয়া তাহা-দ্বিগুণে অত্যাচার হইতে রক্ষা করে? সমাজ! তোমার এ চিত্র কবে মুছিয়া যাইবে? কবে তুমি অবলা রমণীর রোদনে কর্ণ-পাত করিতে শিখিবে?

সরলার জেঠীমাতা এক দিন তাহাকে আশনার ঘরে ডাকিয়া বলিলেন,—“সরলা, তোর মনের কথা আমাকে খুলিয়া বল। তুই এত দুঃখিত হইয়া থাকিস্ কেন? পূর্বেকার মত ভত পড়িস্ না, চুপ করে বসিয়া থাকিস্। আমি কহিতে যদি কিছু উপকার হয়, তাহা তোর দুঃখিনী জেঠি করিতে বাকি রাখবে না।”

সরলা ঐযৎ লজ্জিতা হইল, কোনও কথা বলিতে পারিল না। আজ সে কি উত্তর দিবে, আকাশ পাতাল খুঁজিয়া পাইল না। আজ প্রাণ খুলিয়া মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিল না।

সরলায় জেঠিমাতা আবার তাহাকে বলিলেন ;—

“কেন আজ তুই আমার সঙ্গে শ্রাণখুলে কথা বলছিস্ না কেন ? আমার কাছে তোর লজ্জা কি ? তুই আমার কাছে গুলিয়া বল—”

সরলা তবুও নীরব । তাহার কিছুতেই বাক্য স্কুট হইল না । অল্প কথা তুণিবার অল্প বলিল, “জেঠিমা, সেই দিন শ্রামাচরণ বাবুদের সঙ্গে বাহারী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখেছ ? তাঁহারা কিছু বেশ ! হরেন্দ্র বাবুর কোকদ্দমার চাঁদা আদায় করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে বেড়াতেছেন”—এই বলিয়া চুপ করিল, তাহার জেঠিমা আবার বলিলেন,—

“ও সব কথা থাক, তুই তোর মনের কথা খুলে বল না ।”
সরলা । বলবো আর কি ?”

কি বলিয়া সরলা নিস্তব্ধ হইল, আর কিছু বলিতে পারিল না । লজ্জাই বান্ধালী রমণীর ভূষণ । সরলার জেঠিমাতা সমুদয় বুঝিতে পারিল । সরলাকে ডাকিয়া গোপনে সমুদয় বলিয়া বলিলেন যে, সরলা ইচ্ছনাথের পক্ষপাতিনী হইয়াছে ; গুণের পক্ষপাতী কে কার নয় ? ক্রমে ক্রমে এ কথা পরিবারস্থ সকলেই জানিতে পারিলেন । সরলার মাতা ও পিসীমাতা মিত্র মহাশয়কে এই কার্ণ্যে স্থস্থির করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন এবং তিনি যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

তিনি এ বিষয় শ্রামাচরণ বাবুকে লিখিলেন এবং বাহাতে এই কার্ণ্য স্থস্থির হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন । শ্রামাচরণ বাবুর পূর্ব হইতেই এই ইচ্ছা ছিল এবং তিনি এ বিষয় ইচ্ছনাথ ও তরলাকে অনেকবার

বলিয়াছিলেন। এক গ্রামে বাড়ী, নিজেই ইন্সনাথের পিতার মিকট এ কার্য উপস্থিত করিলেন। তিনি কথায় কথায় বলিলেন,—“ইন্সনাথের কৈলাসপুরে হরকুমার মিত্রের মেয়ের সহিত বিবাহ দিলে মন্দ হয় না ; মেয়েটি বেশ ! এবং মিত্র মহাশয় জাত্যগ্ৰেণ্ড শ্রেষ্ঠ ।

ইন্সনাথের পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “কেন, তিনি কি কিছু লিখিয়াছেন ? তা বেশ, তোমাদের দশ জনের বা মত হয়, তাহাই হবে। মেয়েটি ভাল হইলেই হইল।”

শ্রামা। মেয়েটি খুব সুন্দরী ও কন্সিষ্টা, আমি নিজে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

ইন্সনাথের পিতা বলিলেন,—

“তা বেশ ঠিক করে, কথা বার্তা স্থির কর। প্রজাপতির নির্বন্ধ কোথা হয়, তাহা কি বলা যায় ?”

“আমি তবে তাঁহাকে আসিতে লিখিয়া দিই। তিনি নিজে আসিলেই সমুদয় স্থির হইবে।”

ইন্সনাথের পিতা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা, তাঁর সঙ্গেই এ সমুদয় কথা বার্তা হইবে। তিনি এলেই বাহা হয়, একটা স্থির হইবে। তোমাদের দশ জনের বেখানে ইচ্ছা, সেই ধানেই ত হবে। তার অল্প ভাবনা কি ? মেয়েটি কি যুগ্ম ?

শ্রামা। বহুস বছর চোদ্দ হবে।

শ্রামাচরণ কথা বার্তা একরূপ স্থির করিয়া, মিত্র মহাশয়কে লখিলেন এবং বিবাহ লইয়া খুব আনন্দজনক করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা, ইন্সনাথের সহিত বিবাহ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

—*-

পরিণয় বারতা ।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হইল । ইন্দ্রনাথের কলিকাতার বাইবার দিন নির্দ্ধারিত হইল । শৈশবকালে ইন্দ্রনাথের মাতার কাল হয় ; সুতরাং তাঁহার পিতা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন । মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ উভয়েই তাহাতে সমভাবে বর্ধিতাছিল । ফলে এক এ, পড়ে । তাঁহার বিবাহে পরমা আনিবেন বই স্বর হইতে বাহির করিবেন না, এ দিকে, মিত্রমহাশয় কুলীন । তাঁহার নিকট জ্ঞাতঃ কিছু পাওয়া যাইতে পারে না । বিশেষ তরলা বিবাহের পরেই বিধবা হস্ত; সেই স্বরে ছেলের বিবাহ দিলে, ভাল মন্দ যদি কিছু ঘটে ? এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া তিনি কিছু বিশেষ মত দিলেন না ; বরং, তাহা কিছু অমতই লক্ষিত হইল । জামাচরণ বাবু ইন্দ্রনাথের মতামত স্পষ্ট জানিবার জন্ত এক দিন তাঁহাকে, একাকী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাই, আমায় তুমি স্পষ্ট করিয়া বল ; যদি তোমার এ বিবাহে ইস্কা থাকে, আর তোমার পিতা এ কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে, অবশ্যই বিবাহ দিবেন, অন্ততঃ দেওয়া উচিত ।”

ইন্দ্রনাথ বিষয় সমস্তই পড়িলেন । কি উত্তর দিবেন; তাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না । পাছে মত দিলে, পিতা অসন্তুষ্ট হন । এইরূপ নানাবিধ কথা তাবিতে লাগিলেন । তার পর, মুহূর্ত্তে বলিলেন, “এ বড় কঠিন কথা ! আমি কি

করিয়া মত, দিই ? পিতার মত কি অমত কিছুই জানি না । আমি তাঁহার এক মাত্র পুত্র, আমি হইতে বাহাতে তিনি কোন প্রকার কষ্ট না পান, এই আমার ইচ্ছা ।”

শ্রামাচরণ । তাহা অবশ্যই তোমার কর্তব্য ; কিন্তু এ কার্যে তুমি যদি মত দাও, তাহা হইলে, তাঁহার অসন্তোষের কোন বিশেষ কারণ নাই ; কারণ, মিত্র মহাশয় জাত্যাংশে ত্রৈষ্ঠ এবং ইহা হইতে তাঁহাদের ইচ্ছা ।

ইন্দ্রনাথ । তবু আমার মতামত বলা ভাল দেখায় না । পাত্রী খুব ভাল আমি স্বীকার করি ; কিন্তু আমি পূর্বে কোন কথাই বলিব না । তাঁহার বাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে ।

শ্রামা । বাহা হউক, দেখা যাক্ কি হয় । তিনি ত স্পষ্ট কিছুই বলেন নাই । মিত্র মহাশয় আসিলেই সমুদয় ঠিক হইবে । তোমার কলিকায় যাইবার দিন কি ঠিক হ'লো ?

ইন্দ্র । আগামী মঙ্গলবারে যাইব । ভাই, দুইটী কর্তব্য উপস্থিত, পূর্বে কোন কথা বলিলে, বাবা পাছে অসন্তুষ্ট হন, এই ভয় । আমার মত তাঁহাকে কিছু বলিবার দরকার নাই । তিনি সাহা করেন, তাহাই হইবে ।

শ্রামা । বাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর ।

ইন্দ্রনাথ এইরূপ অনেক ভাবিয়া নিঃশেষ মত কিছুই স্পষ্ট বলিলেন না । পিতা বাহাতে মনে কষ্ট পান, এরূপ তাঁহার ইচ্ছা নয় । যদি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জন দিতে হয়, ইন্দ্রনাথ তাহাতেও অসম্মত ছিলেন না । আবার, একটী বালিকা তাঁহাকে ভালবাসিয়া আপনাকে ভুলিয়াছে । ইন্দ্রনাথের দুইটী কর্তব্য উপস্থিত ; কি করিবেন, ভাবিয়া

ঠিক করিতে পারিলেন না । পিতার তুষ্টি সাধন করিতে আত্ম-বিসর্জন করিবেন, না সমাজের কর্তব্য অনুধাবন করিবেন ?

আজ ইন্দ্রনাথের কলিকাতার ষাইবার দিন । ইন্দ্রনাথ তাঁহার প্রমেনের আবশ্যকীয় জিনিষগুলি ক্রমে ক্রমে সাজাইলেন । গাড়ীর সময় উপস্থিত হইল । ইন্দ্রনাথ পিতাকে ও বাটীর অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন । এক মাত্র সন্তান, বান্ধকের অবলম্বন । ইন্দ্রনাথের পিতা পুত্রকে ছল ছল চক্ষে বিদায় দিলেন । কলেজ খুলিয়াছে তিনি রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন । এ দিকে, বিবাহ লইয়া বাটীতে খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল ।

দেখিতে দেখিতে কালের অনন্ত আকাশে তিন মাস মিশিয়া গেল । এই সময়ে মধ্যে কত অসংখ্য লোকের অদৃষ্টের ফলাফল নিরূপিত হইল ; কিন্তু কই, আমাদের সরলার কি হইল ?

পরে, এক দিন মিত্র মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর পত্রাভ্যুসারে তাঁহার বাটীতে আসিলেন । পূর্বেই নির্দ্ধারিত ছিল যে, এই দিন তিনি ইন্দ্রনাথের পিতার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে সমুদয় সাক্ষাৎ স্থির করিবেন এবং ইহাতে তিনিও স্বীকৃত ছিলেন । মিত্র মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদির পর, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রনাথের বাটীতে গেলেন । ঘটনা ক্রমে, ইন্দ্রনাথের পিতা কোন কার্য বশতঃ সে সময়ে ছানাত্তরে গিয়াছিলেন । মিত্র মহাশয় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন ; কিন্তু দেখা হইলনা । তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া শ্যামাচরণের সহিত ফিরিয়া আসিলেন । মিত্র মহাশয়ের মন ফিরিল

হঠাৎ এক নতুন অভিমান উপস্থিত হইল। পরে শ্রামাচরণ বাবুকে বলিলেন,—“বাপু, তাঁহাদের কেমন ব্যবহার ! বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আজ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব ; কিন্তু তিনি বাটীতে নাই। ইহাতে প্রকারান্তরে জানা গেল যে, তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ নাই ; তবে আমাদেরই বা এমন কি ! আর কি সংসারে পাত্র নাই ? না হয়, আমার মেয়ে পরীক্ষার স্বরে যাবে। তার কি আর তুটো ভাত জুটবে না ?”

শ্রামাচরণ বাবু কিকিং অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—“হাঁ, তাঁহাদের ভাবগতিক কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহারা ত কিছুই পষ্ট করিয়া বলেন না।”

মিত্র। তিনি ত আর জাত্যাংশে ধনমানে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন যে, আমি তাঁহার ছেলের সহিত কার্য্য সুস্থির করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইব। ডোমার ধোঁজে কি আর পাত্র নাই ? বাহা হউক, একটা পেলৈই হইবে, আমি বিবাহ স্থির করিয়া রাখিব।

শ্রামা। কেন থাকবে না ? ইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক রাজনাথ বাবুর সঙ্গে দিলেই হইতে পারে। তাঁহাদের বেশ সঙ্গ-তিও আছে ; তাঁহার উপাধি বিশ্বাস—

মিত্র। তাঁহার অভিভাবক কে ?

শ্রামা। তাঁহার বড় ভাই তিনিও এখানে চাকরী করেন।

মিত্র। বাবা, ডোমার উপর এই ভার রহিল। আমার বিশেষ অনুরোধ, বাহাতে এই কার্য্য সুস্থির হয়, একরূপ করিবে। সিংহ মহাশয় কি মনে করিয়াছেন যে, তাঁহার ছেলে ভিন্ন সংসারে আর পাত্র নাই ? তবে ছেলেটা বেশ ! এই জগৎই বাড়ীর সঙ্গ-

লের ও আহার বিশেষ মত ছিল। তা তাঁহাদের বারই পাওয়া ভার। আমারই কি তবে মাতৃশ্রদ্ধ উপস্থিত ! সে বাহা হউক, তুমি এই কার্য্যটার জোগাড় দেখ।

শ্রামা। তাহা হ'ক, পাত্র অনেক আছে। তবে ইন্দ্রনাথ ছেলেটী খুব ভাল ছিল।

মিত্র। তা বোলে আর কি ক'রবো? আমার ত অমৃত ছিল না। দেখ্লে ত, তিনি কত অপমান কল্লেন?

শ্রামা। তা ত দেখলাম তবুও—

মিত্র। তবুও? তবে কি তুমি বল; আবার অপমানিত হব?

শ্রামাচরণ বাবু মিত্র মহাশয় একটু বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন, "সে বাহা হউক, বাহাতে এ কাণ্ড হয়, এরূপ চেষ্টা করিব, এবং সমুদয় স্থাশ্বির করিয়া আপনাকে লিখিব।"

মিত্র মহাশয় এইরূপ নানাবিধ কথাবাতীর পর, কিছুতেই ইন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিবেন না স্থির করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে বাটী ফিরিয়া গেলেন।

রাজনাথের বাটী—জেলার সন্নিকট একটা গ্রামে। ইনি সেই জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—সবডিভিসনের স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহার ভ্রাতা দেবনাথ বাবুও সেইখানে চাকরী করিতেন। রাজনাথ বাবু গ্রামে খুব 'ব্রাহ্ম' বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং নিরামিত ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন।

এ দিকে, শ্রামাচরণ বাবু অনেক চিন্তার পর, ঐ স্কুলের তৃতীয়

শিক্ষক মতিলাল বাবুর দ্বারা কথা উত্থাপিত করাইলেন। মতিলাল বাবুর সঙ্গে রাজনাথ বাবুর খুব ভাব ছিল এবং ইহার নিকট গ্রামাচরণ বাবু ও ইন্দ্রনাথ বিশেষরূপে পুণরুচিত ছিলেন। গ্রামাচরণ বাবু সেই দিন প্রাতঃকালেই মতিলাল বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনেক কথাবার্তার পর, বলিলেন,— “আপনার নিকট একটি কথা আছে।” মতিলাল বাবু কিকিৎ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি কথা ?

গ্রামা। আমার ভ্রাতৃজন্মের একটি তপস্বী আছে এবং দেহে বৈশিষ্ট্য সর্বাঙ্গ সুন্দর ও গুণবতী। বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন, ইন্দ্রনাথের সহিত এ কার্য উপস্থিত হইতেছিল, কিন্তু এখন হইল না।

মতি। কেন, ইন্দ্রনাথ তা বেশ ছেলে ?

গ্রামা তাহার পিতার তত্ত্ব মত নহে এবং সেও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলে না। রাজনাথ বাবুর সঙ্গে হ'লে কিছু বেশ হয়। এ বিষয় আপনি চেষ্টা করিলে, হইতে পারে।

মতি। তা বেশ, আমি তাঁহাকে ও তাঁহার দাদার নিকট বলিব, তা রাজনাথ পাত্র যন্দ নয়।

এইরূপ অনুরোধ করায়, মতিলাল বাবু এ বিষয়ে সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। অল্পকাল অনেক কথার পর, গ্রামাচরণ বাবু চলিয়া গেলেন। মতিলাল বাবু রান্ন আহার করিয়া স্নানে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

দুই বন্ধু ।

স্কলের ছুটি হইলে, মতিলাল বাবু বাটীতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া রাজনাথ বাবুর নিকট পয়স করিলেন । পরে মতিলাল বাবু নানাবিধ কথাবার্তার পর, বিবাহের কথা উপস্থাপন করিলেন । রাজনাথ বাবু সরলার কথা ইন্দ্রনাথ ও শ্যামাচরণের নিকট শুনা অবধি তাহার শুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ; সুতরাং কথার উপস্থাপন হইবামাত্র ভাবান্তরে এক প্রকার-স্বীকার হইলেন এই দিবাহে ইন্দ্রনাথের মত কি অমত, সে বিষয় এক বারও, ভাবিলেন না । এমন কি, মতিলাল বাবুকেও এ কথা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না । কেবল মাত্র বলিলেন, “হ’লে মন্দ, হয় না ; কিন্তু দাদাকে বলার ভার তোমার উপর ।” ইন্দ্রনাথ রাজনাথের সমুদয় জ্ঞান অচ্ছন্ন হইল, একবারও ভাবিলেন না—বালিকা সরলা ইন্দ্রনাথকে ভাল বাসিয়াছে । রাজনাথ কল্পনার সুদীর্ঘ হার গাঁথিতে লানিলেন ; কিন্তু দেখিলেন না, তাহার ভবিষ্যৎ আকাশ হইতে ঠাণ্ড ধসিয়া পড়িল ।

এক কথা দুই-কথা করিয়া সমাজ লইয়া, হিন্দু বিবাহের রীতি লইয়া দুই জনের মধ্যে নানাবিধ কথা বার্তা চলিতে লাগিল । বর্তমান সমাজে যে নিদারুণ শৃঙ্খলে বন্ধ হইতে হয়, কুসংসারে কুনীতিতে দেশ বৈরূপ প্রাবৃত হইতেছে, হিন্দু বিবাহের দুঃসহ যন্ত্রণা ওহুতি লইয়া নানাবিধ পণ্যবণ্য করিতে

লাগিলেন । হুই জনের হৃদয়ই দেশের হীনবস্থার বিগলিত হইয়াছে এবং হুই জনেরই দীক্ষাময় প্রকৃতরূপে ধর্ম সংস্থাপন করা, কুনীতি ও কুসংস্কারের সহিত হৃদয় পাতিয়া বিবাদ করা ! ক্রমে ক্রমে রাজনাথ বলিলেন,—“তাই, বিবাহ বড় গুরুতর ব্যাপার ; বিশেষ আমাদের সমাজে তো একটা ভয়ঙ্কর কাজ । তোমার কাছে আমার কিছুই অপ্রকাশ্য নাই । আমি মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি যে, এ বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই ; কারণ, ইহা অপেক্ষা আর সুবিধা মত বিবাহ আমাদের সমাজে হইতে পারে না ।”

মতি । হাঁ, শুনিয়াছি মেয়েটা খুব শাস্ত-স্বভাবা ও দেখিতে বেশ উত্তমা । ভাল তাই, তুমি কি নিজে দেখিয়াছ ?

রাজ । নিজে যদিও দেখি নাই, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সত্য, প্রকৃত ও বিশেষ সংবাদ রাখি । বিবাহ করিতে হইলে এইরূপই করা উচিত ।

পাঠক, বুঝিতে পারেন, এ তৃষ্ণা কেমন ? এ তৃষ্ণাকে আমরা কি বলিয়া বুঝাইয়া দিব । যাহাকে কোন দিন দেখি নাই, কেবল যাহার কথা লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাহার প্রতি কিরূপ ভালবাসা হয় ? রূপের ভালবাসা কি স্বর্গীয় ভালবাসা ? ভালবাসার প্রথম নেতা চক্ষু । ইতিহাসে কার্যের ক্ষুব্ধ, গুণবস্তুর কার্যতঃ দৃষ্টান্ত দেখিলে, মহৎ হৃদয়ের প্রতি ভক্তি ও প্রেম হয় বটে ; কিন্তু এ তাহা নহে । আমি ইহা রাজনাথের রূপের রূপ-লালসা বলি । হৃদয়ের আবেগ কল্পজন সংবরণ করিতে পারে ? নব তৃষ্ণা কে নিবারণ করিতে পারে ? প্রজ্জলিত শিখার উর্দ্ধগতি কে বাধা দিতে পারে ? যে পারে, তাহার হৃদয়ে

নৈসর্গিক তেজঃ, তাহার হৃদয়ে কর্তব্যের বল, হিতাহিত জ্ঞানের বল অতি গুরুতর।

মতি। যাই হ'ক ভাই, আমাদের সমাজের নীতি বেরূপ তাহাতে বিবাহ করা একটা হৃদয় বিদারক কথা। যে আচরণ সংসারের সম্মীচরণের দোসর, ধর্মের সহায়, হৃদয়ের অবলম্বন, তাহাকে ইচ্ছানুসারে যে সমাজ গ্রহণ করিতে দেয় না, তাহার অস্তিত্ব কর দিন থাকিতে পারে? অ'মাদের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কিছুতেই চলে না। যে দিকে তাকাই যে নীতি আলোচনা করি, প্রত্যেক বিষয়েই মিরামা। চতুর্দিকে কেবল বিভীষিকা। তবে চেষ্টার ফল নিশ্চয়ই হঠবে, কেবল এই ভরসা। তবে আমি বেরূপ শুনলাম, তাহাতে মেয়েটী মন্দ বোধ হয় না। এ বিবাহে কিছু ভাল হইলেও হইতে পারে। বিশেষ, তোমার যখন কিছু আপত্তি নাই তখন আর যখন তোমাদের মধ্যে তাঁহার প্রেষ্ঠ কুলীন, সূতরাং তোমার বাড়ীর অল্প সকলের অমত হওয়ার কোন বিশেষ কারণ দেখি না। শুনলাম, ইন্দ্রনাথের পিতা এ বিষয়ে তত ব্যস্ত করিতেছেন না।

রাজ। হাঁ, আপত্তি কিছুই নাই। তবে তুমিই শ্রামাচরণকে বলিও যে, সে যেন ও পক্ষে চেষ্টা করে।

হুই জনের এইরূপ নানাবিধ কথাবার্তা হইয়া তাহাদের মধ্যে একরূপ স্থির হইল; রাজনাথের তত কিছু বিবেচনা হইল না। রাজনাথ রূপ লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ আঁধার দেখিলেন। ক্রমে রাতি হইয়া আসিল; অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। তাঁহার হুই জনে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বাটীতে চলিয়া গেলেন। রাজনাথ

তাঁহার নিজের ঘরে বসিয়া একাকী আকাশ পাতাল অনেক কি
 ভাবিতে বসিলেন তাহার স্থির নাই । তিনি কল্পনার একবার
 আকাশের প্রীতিভরা চাঁদখানি তাঁহার পাশে দেখিতে লাগি-
 লেন । দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে হাত বাড়াইয়া ডাকি-
 তেছে, কে যেন কতকগুলি ফুল আনিয়া উপহার দিতেছে ; কিন্তু
 ফুলের ভিতরে যে কীট, তাহা দেখিতে পাইলেন না । অঁধারে
 দেখিতে পাইলেন না যে, এ কীট সে ফুল ছিন্ন ভিন্ন করিবে ।
 ভাবিতে ভাবিতে রাজনাথ মিত্রায় অভিভূত হইলেন । সেই
 স্বপ্ন—সেই স্বপ্নের স্বপ্ন—সেই কল্পনার গাথা সুদীর্ঘ হার সমুদ্রে
 সুলিভেছে !

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—*—

আশায়-নিরাশ ।

ক্রমে ক্রমে বিবাহের সমুদয় সুস্থির হইয়া গেল । রাজনাথের
 জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে পত্র করিতে গেলেন ।
 মিত্রমহাশয় যথেষ্ট আদর করিলেন । বালিকার মস্তকে এ
 সংবাদে বজ্রাঘাত হইল । সেই দিন মিত্র মহাশয়ের একটা
 শিশু সন্তান পীড়িত ছিল ; অতরাং এ আশ্রমে কেহ অন্তরের
 সন্তিত যোগ দিতে পারিল না । মিত্র মহাশয়ের বহির্কীর্মাতে
 চতুর্থমুখে পুরোহিত অস্ত্রান্ত সকলকে অস্থান করিয়া পত্র
 সুস্থির করিতে বসিলেন । কিছুক্ষণ পরেই ক্রন্দনের রোল শুনা
 গেল ; সকলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সকলেই ব্যস্ত হইয়া

পড়িল। জানা গেল, মিত্র মহাশয়ের শিশুটী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। কপটতাময়, যতনার আঁধার সংসারের সমস্ত বাতনা না জানিয়াই পাপসংসার ত্যাগ করিয়া গেল। পরিবারস্থ সক-
সেই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মিত্র মহাশয়ের ভগ্নী তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলেন; আত্মীয় স্বজন সক-
লেই নিষেধ করিতে লাগিলেন যে, পত্র করিয়া আর প্রয়োজন নাই; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, মমতায় কুঠারাঘাত করিয়া, পত্র করিলেন ও বিবাহের দিন স্থির করিলেন।

সে রাত্রি ক্রন্দনের রোলে দুঃখে, নিশ্চয়তার অতিবাহিত হইল। কেহই হতভাগিনী সরলার কথা আর ভাবিল না। দুঃখিনীর প্রদয় যে আজ শাশন হইল, এ কথা আর কেহ ভাবিল না। কেবল সেই স্নেহমণ্ডা অনাথিনী তরলার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু জল সরলার অন্ত পড়িল।

মান রক্তার দায়ে মিত্র মহাশয় জুদয়ে কুঠারাঘাত করিলেন। জাতি অভিমানে পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন। পৃথিবীর প্রতিই এটি। সমাজে মান ভালবাসার চেয়ে আদরের জিনিষ। মিত্র মহাশয় পত্নীদি দ্বারা ঠিক করিলেন যে, বিবাহ রাজনাথের ভ্রাতার চাকরী স্থলে হইবে; কারণ, বাটীর সকলে নানাবিধ বাধা বিঘ্ন দিতেছে, বিশেষ সেখানে কত্যা লইয়া যাওয়া বিবাহ দিলে, খরচেরও অনেক সুবিধা হইবে।

* * * *

ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাহির সিমলায় থাকেন। তিনি তাঁহার আর কতকগুলি বন্ধুদিগের সহিত এই বাসা করিয়া

আছেন ; চৈত্র মাস কলিকাতা ভ্রমণক গরম । তাহার পর, চারিদিকে ভ্রমণক ওলাউঠা বসন্ত ইত্যাদি । পরীক্ষা নিকট, দুই প্রহর বেলায় ইন্দ্রনাথ একমনে বসিয়া পড়িতেছেন ; এই সময় ডাক হরকরা চিঠি লইয়া আসিল । ইন্দ্রনাথের একখানা চিঠি ছিল, তিনি হাতে করিয়া দেখেন, শ্রীমাচরণের লেখা । আগ্রহ সহকারে চিঠি খুলিলেন । খুলিয়া দেখেন, তাহার ভিতর এক খানা চিঠি—সেই তরলার হাতের লেখা । ‘তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল—চিঠি পড়িবার জন্য তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রবল হইল । কি হইয়াছে এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙিয়া পড়িল ; চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন, মাথা ঘুরিত লাগিল, কিন্তু ঠিক করিতে পারিলেন না । অবশেষে হতাশ হনয়ে তাঁহার একটা বন্ধুকে ডাকিয়া অতি দীন অন্তঃকরণে চিঠিখান দিলেন । দিয়া বলিলেন, চিঠিখানি পড় । তিনি পড়িতে লাগিলেন ;—

“ইন্দ্র ! মিত্র মহাশয় ঐ বিবাহে তোমার পিতার অমৃত ও তোমার তত আগ্রহ নাই জানিতে পারিয়া, একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন । তাঁহারা রাজনাথের-সহিত বিবাহ ঠিক করিয়াছেন । রাজনাথেরও এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে । বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত ও পত্র করা হইয়াছে । কিন্তু ভাই, তাহার পর, যাহা জানিতে পারিলাম, তাহা অতি ভয়ানক । যে চিঠি পাঠাইলাম, পড়িয়া দেখিও । অধিক লেখা বাহুল্য । ইতি—

তোমার

“শ্রীমাচরণ ।”

ইল্লনাথের বন্ধু দুইখানি চিঠি আদ্যোপান্ত পড়িয়া বিষয় অন্তঃকরণে দীননয়নে তাঁহার দিকে একবার তাকাইলেন । কাহারও কোন কথা নাই ; গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব করিতে লাগিল । ঋনিক পরে, ইল্লনাথ বলিলেন, “এখন কি করা উচিত ? আমার প্রাণ দিয়া যদি সংসারে একজন কীটাত্মকীটকে রক্ষা করা যায়, তাহাতেও আমি বিশেষ সম্মত । আর একজন বালিকা ভাই, আমার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত । আমার কি ঐ সময়ে চূপ করিয়া থাকা উচিত ?

বন্ধু । ভাই, সে দোষ তোমার, আর তোমার বাটীর লোকের । তুমি যদি পূর্ষ হইতে একটু বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে, তাহা হইলে, একুপ হইত না । এখন সময় চলিয়া গিয়াছে আর ত কোন উপায় দেখি না । এখন যদি সমাজের মূলে আঘাত করিতে পার, তাহা হইলে হয় ।

ঠেল । যে ভুল হইয়াছে, তাহার ত কোন উপায় দেখি না । আমার মনে বা হ’ছে, তাহা মনই জানে ; আর সেই সন্দেহ নিবৃত্তা জানেন ! এখন কি করি ?

বন্ধু । উপায়ত কিছুই নাই, তবে একবার চিঠি লিখিয়া দেখা উচিত । ব্যাপারটী কতদূর গড়াইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ ?

দুই জনের এইরূপ নানাবিধ কথাবার্তা চলিতে লাগিল । অনেক আলোচনার পরে, ঠিক হইল যে, একুপ কোন চিঠি দেখা বাউক, তাহাতে ইল্লনাথের পিতা এ বিষয় জানিতে পারিয়া সবিশেষ চেষ্টা পান ।

সংবাদ গেল । ইল্লনাথের খুশীতাত এ বিষয় সমুদয় বুঝিতে পারিলেন । তাঁহার পিতারও তখন নয়নে জল আসিল, বুঝিতে

ভাবিতে পারে? বিশেষ এ সব কথা জাতি মনে লইয়া। মেয়েকে অল্প বিবাহ দিলে ত এক রকম বিধবা বিবাহ হইল। আপনাদের এত দরকার থাকিলে পূর্বেই চেষ্টা করা উচিত ছিল।”

ইন্দ্রনাথের খুল্লতাও এইরূপ নানাবিধ অমুনয়ের পর, হতাশ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বাটীর অন্যান্য সকলে এ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলেন; কারণ, ইন্দ্রনাথ একমাত্র ছেলে, বাহাতে তাহার মনে কষ্ট না হয়, এই সকলের চেষ্টা। সকলেই বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কুসংবাদ বাতাস অপেক্ষা শীঘ্র প্রচারিত হয়। ইন্দ্রনাথ শীঘ্রই এ সংবাদ কলিভাতায় শুনিলেন। শুনিবামাত্র বিকল-চিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে আপনাকে শত বার দিক্কার করিতে লাগিলেন এবং নির্জনে সমাজের অত্যাচার, দেশের কুসংস্কারের কথা ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জন করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, সুখ বৃত্তচ্যুত হইল; দেখিলেন, ভাবী অদৃষ্ট আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। ভয়ানক অন্ধকার! সমাজে এরূপ ঘটনায় যে কত জনের হৃদয় শোষিত। উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। হৃদয় ক্রমে অবশ হইয়া আসিল, সংসার আঁধার দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে বল আশ্রয় করিয়া নির্জনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ সমাজ যাহাতে উন্নত হয়, এই তাহার হৃদয়ের প্রাণের ব্রত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

আশা-কুরাইল ।

বৈশাখ মাস—বেলা অবসান প্রায়। সূর্য্য পশ্চিম গগনে ডুবু ডুবু করিতেছে। পশ্চিম আকাশ রক্তিম। কাল বিবাহ হইবে,—মিত্র মহাশয় আজ কত্না লইয়া বিবাহ স্থলে যাইবেন, এটো স্থিরীকৃত করিয়াছেন। বাটীতে ভয়ানক গোল পড়িয়া গিয়াছে। বিবাহ হইবে, কোথার আমোদ, না ক্রন্দনের গমন-ভেদী গোল! বালিকা প্রাণের যাতনা দুচাইবার জন্ত উঠে:খবে রোদন করিতেছে। সুখিনী জানে না, নিম্নম হিন্দু সমাজে সমস্তার ক্ষমতা কত হীন। বালিকা বুঝিতেছেননা যে, তাহার প্রমাদে ভয়ানক করিয়াছে, সেই যেহেতু পিতা আজ বনের ন্যায় প্রশংসা ব্যবহার করিতে উদ্যত; সরলা বালিকা মনে করিয়াছে, কাঁদিলে পিতার হৃদয় গলিয়া যাইবে, তাহার প্রতি দয়া হইবে, অনাধিনী এবার রক্ষা পাইবে। কিন্তু কোথায়? জগৎ কাঁদিল, প্রকৃতি বিবশা হইল। সূর্য্য পলায়ন করিল, তবুও নিশ্চয় হৃদয়ে দয়া হইল না। পাষণ্ড হৃদয় একবারও ভাবিল না, তাঁক অসির মুখে তাহার ঘেহের পুতলী সরলাকে ঠেলিয়া দিতেছি। বজ্রময় প্রাণে এহবার দয়ার সংকল্প হইলও না।

নিষ্ঠুর পিতা সেই বিবশ বালিকাকে সবলে লইয়া নৌকা-যোগে করিল, বালিকার কোমল শরীরে বল প্রয়োগ।

দেখিতে দেখিতে বালিকা সংজ্ঞাহীনা হইল। পদ্মার বিশাল বিস্তৃত তরঙ্গের উপর তরঙ্গী হেলিতে হুলিতে চলিল। চেউ একবার উঠে অমনি ফাটয়া যায়। অনন্ত বিস্তৃত তমসাস্কন্ন আকাশ দিগন্ত ব্যাপিয়া মাথার উপরে, নিম্নে তরঙ্গাকুলিত পদ্মাবক্ষ। তরঙ্গী, সংজ্ঞাহীনা বিমুঢ়া বালিকাকে লইয়া স্রোতে ডাসিয়া চলিল। আজ এত দিনের পর, বালিকার সুখ, শান্তি, আশা, ভালবাসা, সকলই নদীর স্রোতে ভাসিয়া সাগর মুখে ছুটিল। সে সুখ, সে শান্তি, সে আশা, সে ভালবাসা কিছুই আর ফরিবে না। এত দিন পরে, জন্মভূমি পরভূমি হইতে চলিল। পর আপনার হইতে চলিল। বালিকার চেতনা নাই। নিদ্রিতা সরলা দেখিতে পাইল, সমুদ্রে বিস্তীর্ণ সাগর তাহাতে সে ভবিষ্যছে - অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু নির্দম পিতার অন্তঃকরণে এখনও দয়া নাই, এখনও একবার ভাবিতেছে না, এখনও একবার মনে করিতেছে না, তাহার সরলার কি হইবে? কোন অকুল পাথরে সেই মেহ পুতলীকে ভাসাইতে যাইতেছে।

কিছুই চিরকাল থাকে না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি এভাত হইয়া গেল। নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নৌকা রাজনাথের লাতার কঙ্কশানে উপস্থিত হইল। বরপক্ষীর কর্তৃপক্ষগণ হুট এক জন তীরে পাশ্চি লইয়া নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন : সুতরাং মিত্র মহাশয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরস্পর নানাবিধ কথাবার্তা হইতে লাগিল। সরলার চোখে আর জল নাই; হৃৎপিণ্ড তাহার চক্ষুর জল ওখাইয়া গিয়াছে এখন বালিকার কোমল হৃদয় দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। বালিকা

দুঃখিগাছে তাহাকে অদৃষ্টের অধীন হইতে হইবে, সংসার তাহার সুখের জন্য নহে । মিত্র মহাশয় সরলাকে পালকিতে উঠাইয়া লইয়া রাজনাথের বাসায় উপস্থিত হইলেন ।

রাত্রিতে বিবাহ । সকলেই আমোদ প্রমোদ মত্ত । বাড়ীতে হলধূল পড়িয়াছে ; কিন্তু সরলাও মনে অনেক বাতনা । আজ তাহার জীবনের, প্রিয় সুখের দিন । আজ সে কি ভয়ানক নরকে পতিত হইবে, দুঃখিনী তাই অদৃষ্ট লইয়া ভাবিতে বসিল ? বিকলঙ্গদয়া কিছুট দুঃখিতে পারিল না । যতই ভাবিতে লাগিল ততই আঁদার দেখিতে লাগিল । একটি নির্জুন বয়ে বসিয়া তাহার শেষ পয় লিগিল । প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা লিপিতে মনে করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না ।

"প্রাণাচরণ বাবু, এই আমার এ জন্মের শেষ পত্র । মনে ছিল, আপনাদের সঙ্গে অনেক আমোদ করিব ; আপনাদের নিকট হইতে অনেক শিখিব ; কিন্তু সে সমস্ত আশা এ জন্মের মত মিটিল । আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হইবে না ; ঈশ্বর করুন আর যেন না হয় । আমার কপাল লইয়া আমি ভাবিব, আমার দুঃখ লইয়া আমি কাঁদিব, আমার দুঃখ লইয়া আমি পুড়িব ও মরিব । আপনাদিগকে আর বাতনা দিতে চাই না । পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আপনারা যেন সুখে থাকেন ।

শব বিদায়—

সরলা কাঁপিতে কাঁপিতে পদধানি লিখিল । কত কি লিখিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের সময় হাতে কিছুই আসে না । মনের কথা কে গুলিয়া লিখিতে পারে ? জন্মের ভাব

প্রকাশ করিতে পারিলেই সুখ । অভাগিনীর অদৃষ্টে যাহা হইবে ? পত্রখানি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাতে দিয়া সরলা শ্রামা-চরণের নিকট পাঠাইয়া দিল । কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল । আবার অদৃষ্ট লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে বসিল । বিবাহের দিন উপবাস ; সুতরাং, তাহার পক্ষে আরও ভাল হইল । নিরুজ্জ্বল অলঙ্কিতা অপরিচ্ছাদিতা হইয়া বালিকা আজ প্রৌঢ়ার ত্যায় ভাবী সংসার লইয়া, পাপপুত্রের পরিণাম, জগতের শেষ অদৃষ্টের ফলাফল, জন্মের বল লইয়া ভাবিতে বসিল । সরলা আজ রক্তা, সরলা আজ উপদেষ্টা দেবী, বৈরাগ্যের অনন্ত দয়্যাসিনী, সংসারে আজ তাহার অনায়াস, আজ সে মধ্য বিম্বের আলোচনা লইয়া ব্যাপ্তা, আজ তাহার জন্মে চিত্তের ত্যায় দূর করিয়া আগুন জলিতেছে । আজ সে অনেক কণে জগতের শিক্ষাঙ্গণীর ।

ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল । বিবাহের লগ্ন সন্ধারাত্রেয় ; সুতরাং আয়োজন শীঘ্র হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে বিবাহের সময় উপস্থিত হইল । পুরোহিত সমুদয় আয়োজন করিয়া মঞ্চ পাঠ করিতে লাগিলেন । সরলা নিজের অদৃষ্টে অল্প সমর্পণ করিল । বিবাহ হইল, বালিকার শেষ আশা নিব্বা গেল, সমাজের চিত্র স্থাপ্ত হইল । প্রাজ্ঞমহাশয় তুমিও বুঝলে না যে, তুমি নিজেই তোমার কণের পথে কষ্টের । এই কি তোমার শিক্ষা ? তুমি না উনবিংশ শতাব্দির শিক্ষিত যুবক ? ধর্ম্মসমাজের নেতা ও আদর্শপুরুষ ? তোমাকে এ সমাজ কেন ছান পাইল ? বুঝি না । এই কি তোমার কণবাপ্তান ? তুমি না সর্বদাই বলিতে যে সমাজের সংস্কার তোমার জীবনের

ব্রত ? এই কি সেই ব্রত পালনের ফল ? হা সমাজ ! তুমি কবে কালের অনন্ত গ্রাসে মিশিয়া যাইবে ? কবে জগৎ তোমার অন্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে ?

আবার বলি রাজনাথ ! এই কি উচ্চ শিক্ষার পরিমাণ ? এত দিন ধর্ম্মের প্রচারক, সত্যের সহায় বলিয়া পরিচয় দিতে কেন ? এই কি তাহার দৃষ্টান্ত ? তোমাকে শত ধিক্ !

ইন্দ্রনাথ বাটিতেই ছিলেন ; স্মৃতরাং, সমুদায়ই শুনিলেন । হৃদয় কাটিয়া বাইতে লাগিল । কি করিবেন, উপায় নাই । সমাজের এই দোষ, কুসংস্কার-পুষ্ট হিন্দু সমাজের এই নির্মমতা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল,—নির্জেনে অশ্রু বিসর্জন করিলেন । তিনি একবার মনে করিয়াছিলেন যে, নিজে বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হইয়া এ জন্মের মত একবার সরলাকে দেখিবেন । কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ নিষেধ করায় ; সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না । মানব হৃদয়ের বল কত টুকু । আশায় নিরাশা মানুষের প্রাণে সহিবে কেন ? ইন্দ্রনাথের স্মৃতির আশা মিটিয়া গেল ।

সমাজের উন্নতি সাধন করা, কুসংস্কার দূরীভূত করা, হৃদয়ের মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, পর দিন শান্তির জন্ত বাড়ী পবিত্যাপ করিলেন । পিতা, বন্ধুগণ ও সমাজকে নিষ্কর্মে শিক্ষা দিলেন যে, কত কুনিয়ম সমাজের অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে । কত রমণী কত অবলা বালিকা, কত উন্নতবয়স্ক যুবক এই প্রকার জন্ত দুর্ভিক্ষের বস্ত্রণ ভোগ করিতেছে । কত জনের স্বপ্ন, আশা, শাস্তি এই কঠোর নিয়মে বৃদ্ধচূড় হইতেছে । পিতার প্রতি সমাজের কর্তব্য শিক্ষা দিতে ইন্দ্রনাথ এক অপূর্ণ শিক্ষা দিলেন । লোকে বুঝিল না যে, ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য কি ?

নবম পরিচ্ছেদ

রমণীর হৃদয় ।

দিন যায়, মাস যায়, কিছুই চির দিন সমভাবে থাকে না । নিয়তির অনন্ত গর্ভে সকলেই একদিন মিশিয়া যায় । পরিবর্তনই জগতের মূলভিত্তি ; পরিবর্তনেই প্রকৃতির কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে চলে । যে পথের কান্দাল, সে চিরদিন পথের কান্দাল থাকে না ; তাহার অদৃষ্টে একটু সুখ নিয়তির চক্রে অবশ্যই ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন আসিবে । আবার যিনি রাজা, তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য চিরদিন সমভাবে থাকে না ! পূত্রশোকে কাতরা জননীর মনে দুঃখের স্মৃতিও চিরকাল থাকে না । তাই বলি, ভাগ্য চির কাল সমভাবে থাকে না ।

সরলার দিন, অনন্ত দুঃখে সপ্তাহে সপ্তাহ মাসে মাসে বর্ষে বর্ষ মিশাইয়া যাইতে লাগিল । প্রাণ আঁধার—তাই সংসার আঁধার—জগৎ আঁধার ! শাশানের স্রাব স্মৃতির আগুনে হৃদয় ধ্বংস করিয়া জলে । হৃদয় শূন্য । জগতে তাহার য'হা হারা-ইয়াছে, তাহা ধু'জিয়া পায় না । চাহিয়া দেখেন, ধরিতে গিয়া ধরা পড়ে না । যে জিনিষ হারাইয়াছে, তাহার ছবিখানি নেশ মনে পড়ে ; কিন্তু সে ছবির মত একখানিও ছবি প্রকৃতির ভাঙারে মেলে না । তাই বলি, বাহার হৃদয় শূন্য, সে জগতে কিছুই পূর্ণ দেখে না । আবার রাজনাথের অমুতাপ—রাজনাথ

জগতে কি কার্য্য করিয়াছেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। তাহার হৃদয় হইতে কি অলিত হইয়াছে, বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার প্রীত নাই, মুখ নাই। যে, বিবাহে অনন্ত সুখ ভোগ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে আবার সুখ দেখেন না কেন? জগতের লীলা বিচিত্র! কখন কি হয়, তাহা স্থির করা মানব জ্ঞানের সীমাতীত।

সরলা ক্রমে ক্রমে হৃদয় বাঁধিতে লাগিল। না বাধিয়া আর কি করিবে? সমাজের কঠোর নিয়মে তাহার কোন হাত নাই। সমাজ বাহা দিবে, বাহাকে দিবে, তাহা লইয়াই অবলাগণকে হৃদয় বাঁধিতে হইবে; এ বাঁধা পূর্ব্বে বাঁধিতে পারে না—কিন্তু অবলাগণের প্রাণে অনেক সহ্য পায় বলিয়াই এ অত্যাচার এ কঠোর বাঁধা এত দিন সমাজে প্রবল প্রভাবে চলিয়া আসিতেছে। সরলা মনে করিল, “কেন আর এ বিষে হৃদয় জ্বলাইব? সমাজের কীট হইয়াছি, সমাজকে দেখাইব অবলা রমণী হৃদয় অর্পণ করিব ও প্রীত অর্পণ করিব, ভক্তির আশ্রয় করিব। তাহা যদি না পারি, তাহা হইলে পবিত্র সতীর ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলাম; প্রাণের প্রাণ হারাইলাম। হিন্দু রমণীর পতিই জ্ঞান, পতিই পরম আরাধ্য দেবতা। সরলা পতিসেবা আরম্ভ করিল, হৃদয় বাঁধিল, সংসার ভুলিয়া গেল।

* * * *

এক দিন রাজনাথ বসিয়া আছেন, পার্শ্বে সরলাও বসিয়া রহিয়াছে, উভয়েই নীরব। রাজনাথের হৃদয় ভূত ভবিষ্যৎ লইয়া বিচলিত। ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না যে, সংসারে তাঁহার কি হইয়াছে। রাজনাথের চিন্তা অনন্ত ও গভীর

ভবিষ্যৎ-আকাশে রাজনাথের নিকট তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। সরলাকে ? কেন বিবাহ করিলাম ? এ বিবাহের পরিণাম কি ? রাজনাথ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। মুখ বিষম, সরলা নীরবে পাশে বসিয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, রাজনাথ মুহূর্ত্তে বলিলেন, "সরলে, বাস্তবিক কি আমি পাপ করিয়াছি ? তবে প্রায়শ্চিত্ত কি ? এ পাপের পরিণাম কি ?"

রাজনাথ এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। বাস্তবিক রাজনাথের হৃদয় পতীর অনুতাপে ও দুঃখে পরিপূর্ণ। সরলা রাজনাথের ভাব দেখিয়া বলিল, আমি ত জানি, বাঙ্গালীর মেয়ের ইচ্ছানুসারে বিবাহ হয় না। তাহাই হ'ক, পতিই নারীর আরাধ্য দেবতা। পতিপূজা স্ত্রীধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, যদি ভোমার মনে কোন প্রকারে ব্যথা দিয়া থাকি, তাহা হইলে মাফ কর।"

রাজনাথ। না সরলে, মাফ করিতে হইবে না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য হৃদয়ে আমার বে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা সৰ্ব্বনিয়ন্তাই জানেন।"

সরলা আর কোন উত্তর করিল না। দীর্ঘ নয়নে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল হৃদয় উৎসর্গ ও পতিপূজা আজ হইতে তাহার হৃদয়ের এত হইবে। আজ হইতে সে নির্জনে শিক্ষা দিবে, আত্মত্যাগ স্ত্রী ধর্ম্মের শিক্ষণীয় একমাত্র প্রধান অঙ্গ। যুবতী কাদিতে কাদিতে বলিল, "না বুঝিয়া হৃদয়ের দুঃসলতা অনেক পাপ করিয়াছি ; নারীর বাহা প্রধান কল্যাণ, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। আমার

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।* সরলার আর বাক্যফুট হইল না। রাজনাথ স্বর্ণ দেখিলেন। মনে মনে বুঝিলেন, স্বর্ণ স্বীলোকের হৃদয়ে। পতিব্রতা তাহাদের আশ্রয় বিসর্জনেন। যে নারী পূজা করিতে পারে, তাহার হৃদয় ধর্মের বিকৃত প্রাপণ সরলা শিক্ষা দিল, নারীর হৃদয়ে কত বল। নারীর হৃদয়ে কত আবেগ ! নারীর ক্ষমতা কত অধিক।

দশম পরিচ্ছেদ ।

ব্রহ্মচারিণী তরলা ।

আমরা সংসার পাতার কথা ভুলিয়া, সংসার উদ্বাপনের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তরলা এখন আর পিতৃগৃহে নাই। ব্রহ্মচারিণী এখন দেবী ভাবে, গ্রামচরণের পূজিত, গ্রামের শোভাবিত, অপূর্ণ রূপবতী, ভক্তিমতী তরলা শোভা পাইতেছেন।

তরলা ভগ্নির বিবাহে প্রথমে বহুটা দুঃখিত হইতেছিলেন এখন আরো সে দুঃখের পরিমাণ অপেক্ষা সত্বর গুণ সুখী হইয়াছেন, ভুলিয়াছেন ও দেখিরাছেন সরলা রাজনাথম্বর ও রাজনাথ সরলাম্বর হইয়াছেন।

বাকালী মেয়ের পক্ষে, বঙ্গ বধূর অদৃষ্টে চিন্দু ললনার পূর্ণ-কৃত পুণ্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে ? তরলা প্রথমে ভাবিয়াছিল, বৈজ্ঞানিক ভিন্ন সরলা আর কাহার

ও হইবে না, কিন্তু পিত্রাদেশে নিজ আত্মতাগের ইহাই একমাত্র আদর্শ, ভাবিয়া তরলা ছুঃখ অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখী হইয়াছেন। একদিন তরলা ভগ্নি প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্র খানি পাইয়াছিলেন—

দিদিমণি!

আমি এখন কি সুখী, তাহা বলিতে পারি না, রাজনাথ আমাকে চক্ষের আড়াল করে না, পুরুষ হৃদয়ে এত কোমলতা, এত মমতা, এত ভালবাসা আছে বলিয়া আমি জ্ঞাত ছিলাম না, পূর্বে আমি তোমার জন্ত, বাধার জন্ত, মার জন্ত, বাটীর জন্ত কাঁদিতাম, রাজনাথও আমার চক্ষে জল দেখিয়া স্ত্রীলোকের জায় কাঁদিয়া অস্থির হইতেন, এখন আমি কাঁদি না, ভাবি!—কিন্তু আমার বিরস বদন দেখিলেও তোমার ভগ্নিপতির তরল চক্ষে শতধারার অশ্রুপাত হয়, তাই! আমরা অল্প বিশ্বাসী তাই জীখরের ইচ্ছায় ক্রুদ্ধে কার্য্য করিতে যাই, কিন্তু তিনি মঙ্গলময়, তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছায় আমাদের অনবরত মঙ্গলই সাধিত হইতেছে, এত সুখ এমন হৃদয়বান, এমন স্নেহ শীল, এমন গুণবান স্বামী যে আমায় অদৃষ্টে ঘটবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিনা, তুমি যে কুমারী অবস্থায় আমার শিবপূজা করাইয়া ছিলে তাহা সার্থক হইয়াছে, তোমারই পুণ্যে আমি মহাদেব তুলা প্রকৃত্তবদন স্বামীধনে অধিকারী হইয়াছি যদিও আমি ধনবানে পত্নী হই না, কিন্তু আমি দে অমূল্য স্বামী ধনে অধিকারিণী তাহা অনেক রাজ্যেশ্বরীর ভাণ্ডেও সংবটন হয় না।

আমার ভাণ্ডের সীমা নাই; স্বামী আমার দেবতা, আমি

সামান্য সংসারের কীট অল্প বুদ্ধি নারী বলিয়াই এ সাক্ষাৎ দেবতাকে এত দিন হৃদয় ভরিয়া পূজা করিতে পারি নাই ।

দিদি ! আশীর্বাদ কর, এক্ষণ মনোমুখে যেন আমার দেহান্ত হয় ।

সেবিকা

শ্রীমতী সরলা—

সরলা পত্র পাঠ করিলেন, পত্র পাঠ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলে তাঁর বিষাদ হৃদয়ে নব হর্ষের উদয় হইল, তিনি আপনাকে ভুলিয়া, ছোট বোনটিকে কার্যমন বাক্যে আশীর্বাদ করিলেন । অশান্তিতে দন্ধ, বিরহ বিধূরা তরলা, সরলার মুখে নিজের সকল দুঃখ ভুলিলেন, যেন তরলা সরলার মুখ উপলব্ধি করিলেন ।

স্বার্থ জড়িত সংসারে কেহ অপরের সুখে সুখী হয় না, বরং অনর্থক অগাধ দুঃখ পায়, তুমি সংসারে শাস্তিকে বাস করিতেছ, কিন্তু হায় ! তোমার প্রতিবাসীর অসহ্য হইবে, তুমি সুখে আছ, তোমার প্রতিবাসী সর্বদা ব্যস্ত দৃষ্টি সর্বদা তোমার উপর রাধিবে, তুমি যদি ছুবেলা পেট ভরিয়া দু'মুটো খাইতে পায়, তবুও তুমি প্রতিবাসী নিকট নিস্তার পাইবে না, প্রতিবাসীত দূরের কথা, তুমি জ্ঞাতগণের এমন কি সহোদর ভাইয়ের নিকটে বিষময়নে বিদ্রোহের দৃষ্টিতে হিংসার কটাক্ষে পতিত হইবে । ধন্য হিংসার—কাল, কলি কাল ! তুমি কি স্বার্থ সমুদ্রে মানবদের ডুবাইবাব জন্ত বন্ধ পরিকর হইয়াছে, পরের সচস্র ক্ষতি হউক, নিজের বাহাতে এক কপর্দকের ক্ষতি না হয়, জগত মরিয়া হাজিরা খাউক, নিজের মনের সমস্ত কেশগাহীও

নউ না হয়, কলি! এ সৰ্কনাশকারী স্বার্থ তুমি কোথা হইতে আনিবে; কেন? কেহ কাহার ভাল দেখিতে পারে না, কেন কেহ কাহার সৌভাগ্য হৃদয় প্রকাশ করে না, কেন প্রাণ তরিয়া কেহ কাহার হুঃখে কাঁদে না, কাহার দুঃখে সহানুভূতি করে না। ছি! ছি! স্বার্থ! তুমি বুদ্ধিমান মান-বকে পণ্ড করিতেছ, দেখিতে পাই ইতর প্রাণীদেরও স্বজাতি-প্রিয়তা আছে, কিন্তু বান্ধালী যে হীন হইতে হীনতর হইতেছে, স্বার্থ তুমি একটু অন্তর হইতে স্থানান্তরে যাও, তুমি স্থানান্তরিত দিলে উদরতা দেখা দিয়া বান্ধালীকে একটু ভদ্রলোক করিবে। কাল মাহাশ্বেই বান্ধালীর এ হৃদশা. নতুবা বান্ধালী এক দিন দেবতা ছিল, দেবতা ছিল বলিয়াই এখন ও হু একটি উচ্চ হৃদয়ের দেবতা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়. কিন্তু পূর্ব পুত্র ফলে অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ হৃদয়ের ললনা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্বার্থ জ্ঞান বর্জিতা তরলা, স্বার্থ যে কি তাহা জানিত না, সহোদরা ব্রহ্ম মমতায় হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, তাই তরলা সরলার পত্রের আপনা ভুলিয়াছিলেন; তাই তরলা প্রত্যন্তর লিখিয়াছিলেন,—

বোন সরলা!

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম, তুমি যে সুখী হইবে ইহা আমি কখন ভাবি না, ভগবানের নিকট—প্রার্থনা করি, তুমি পরমধন পতিধনের হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া তাঁর নয়নপুতলী হও, বোন! স্বামী স্রীলোকের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন, কখন স্বামীর অবাধা হও না, স্বামীর পদধূলি প্রত্যহ শয্যাভ্যাগের পূর্বে লইবে, স্রীলোকের স্বামী সেবা

একান্ত কর্তব্য, স্বামী আহারের সময় নিকটে বসিয়া বাহাতে তিনি তৃপ্তি করেন করিবে, স্বামী শয়ন করিলে তবে শয়ন করিবে, বাহাতে স্বামীর সুনিদ্রা হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে, স্বামী ক্রান্ত হইলে নিজে অসুস্থ থাকিলেও স্বামীর আরাম বিধান করিবে, আজকাল ইংরাজী সভ্যতার অনেক ভঙ্গি স্বামীকে ইয়ার করিয়া তুলিয়াছে, কোন ঘটাই নয় না, নিজের সুখ হইলেই যথেষ্ট, এরূপ স্ত্রীলোকের কখন স্ত্রী জীবনের সুখ হয় না, স্ত্রীজাতি হৃদয় হারা না হইলে, আপনারা তুলিয়া না বাইলে, লজ্জাশীলতা স্ত্রী কখনই যে স্ত্রীলোককে আশ্রয় করে না, তবেই সে স্ত্রীলোক কখন সুখি হয় না। ভগ্নি! তুমি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য স্রোতে গা ঢালিয়া দিবে না, নিশ্চয় স্বামী দেবত', স্বামী স্বর্গ, স্বামী পুণ্য, স্বামী ব্রত, স্বামী সর্বস্ব আনিবে। ভগ্নি! অত্যা এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্নেহাভিলাষী

শ্রীমতী তরলা ।

তরলা পত্র খানি শেষ করিয়া একবার পাঠ করিয়া আবার পাঠ করিলেন, পরে শিরোনামা লিখিয়া সরলা সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর তরলা অত্র দিনের মত হরিনামের মালা লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপে বসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

বাঙ্গালী বউ ।

সরলা খিড়কীর বাগানে বেড়াইতেছে, পশ্চাত হইতে রাজকুমার সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন ।

সরলা । চিনেচি ছাড়, ছাড় ।

রাজকুমার । আগে বল আমি কে ?

সরলা । তুমি আমার হৃদয়ের মণি, তুমি আমার প্রাণেশ্বর—

রাজকুমার । এখন গুরুভক্তি রাখ, ঠিক করে বল আমি কে ?

সরলা । তুমি সেই আঁধার ঘরের মাণিক ।

রাজকুমার । চিনেচ, এখন চোক ছাড়তে পারি ।

রাজকুমারের বর্ণ ঘোর ক্রুদ্ধ বলিয়া সরলা কখন কখন আদর করিয়া আঁধার ঘরের মাণিক বলিয়া ডাকিতেন, রাজকুমার এই কথাটি বড়ই গিষ্ট বোধ করিতেন ।

রাজকুমার সরলার চক্ষু হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া লইলেন । উভয়ে বকুলতলায় বসিলেন ।

সরলা আদরস্বরে বলিলেন—

তবে কালমাণিক কোথা হইতে এখানে এলে ?

রাজকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

তুমি যেখানে আমিও সেখানে তাকি তুমি জান না ?

সরলা । তবে আমরা মাণিকজোড় ।

না—লো না, মণিকাধন সংযোগ ।

নেপথ্যে মধুরস্বরে এই কথাটি উচ্চারিত হইল, উভয়ে

সেইদিকে চাহিলেন ; দেখিলেন, পূর্ণ চন্দ্রমুখী, ষোড়শী নির্মলা হাসিতে হাসিতে আসিতেছে ।

নির্মলা আমাদের বসন্ত বাবুর নব বিবাহিত বধূ, বসন্ত রাজকুমারের জ্যতি, ভ্রাতা ও প্রতিবাসী বন্ধু, নির্মলা পূর্বে সরলার সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিল, এবং এক গ্রামে ছুজনের বিবাহ হইয়াছিল, তাহ, রাজকুমার সম্পর্কে দেবর, নির্মলা সরলার পাঠ সহচরী, এই সকল কারণে বন্ধুতার জমাট হইয়াছিল, কেহ কাহাকেও লজ্জা করিত না, মন প্রাণ খুলিয়া সকলকে সকল কথা কহিত ।

বসন্ত বাবু ও রাজকুমার বড় বন্ধু ।

নির্মলাকে দেখিয়া উভয়ে বড় আশ্চর্য হইলেন ; সরলা দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন,

নির্মলা । চল চল নেত্রে বলিলেন, তিনি আজ কদিন কলিকাতায় গিয়াছেন, মনটা বড় খারাপ হইয়াছে, তাঁর কে এক বাংলা বন্ধু নাম কি ভাল ইন্দ্রনাথ না কি ? মনে পড়ছে না সে নাকি উদ্ভাস হইয়াছে, তাই তাঁহাকে স্মৃষ্টি করিবার জন্ত কবিবাজী চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় লইয়া গিয়াছে ।

ইন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া সরলা চমকিত হইলেন । পূর্বের অনুরাগ, পূর্বের সকল কথা চাঁকতের জায় মনে হটল, আন্তরিক উদ্বেগ প্রাণে জাগিল ; আবার তখনি সরলার পত্র, স্নানীর অকৃত্রিম ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া সরলা প্রকৃতিত হইলেন, কেবল বাহ্য লক্ষণে মুগ্ধ রত্নমণ্ডিত হইল মাত্র ।

চতুর রাজকুমার সকলি বুঝিল ও বলিল, ইন্দ্রনাথের উদ্ভাসের কারণই আমি ।

সরলা—কেন নাথ ! ও কথা বল ! ও কথা বলে আমার কষ্ট দিয়া লাভ কি ? হিন্দুর বিবাহ ত পুতুলের বিবাহ নহে ; ইহা বিধাতার নির্বন্ধ, প্রজাপতির ইচ্ছা, মঙ্গলময় মঙ্গলের জন্ত আমাদের পতি পত্নী নিজে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যার বা তার তা হইবেই, হাজার চেষ্টা কর, কিছুতেই নে চেষ্টা বোধ হইবে না। নাথ ! বাস্তালী-বউ, কচি মেয়ে বই আর কিছুই নয়, কিন্তু বল দেখি নাথ ! বাস্তালী বউয়ের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বল কত ? নূতন স্থানে, নূতন লোকের কাছে গেল, সেখানে আত্মীয়তা সেখানেও আপনার করিয়া লইতে হইল ।

রাজকুমার বলিলেন,—সরলা সত্য বলিয়াছ, তাই আমি বাস্তালীর মেয়ের এত গুরুপাতী, ধন্য বাস্তালী বউ, তোমাতে সরলতা, লজ্জাশীলতা, স্নেহমমতা, পতিব্রতা থাকিতে, দুই হিন্দু সমাজের কোন ভয় নাই ।

ধন্য ! বাস্তালী বউ !



